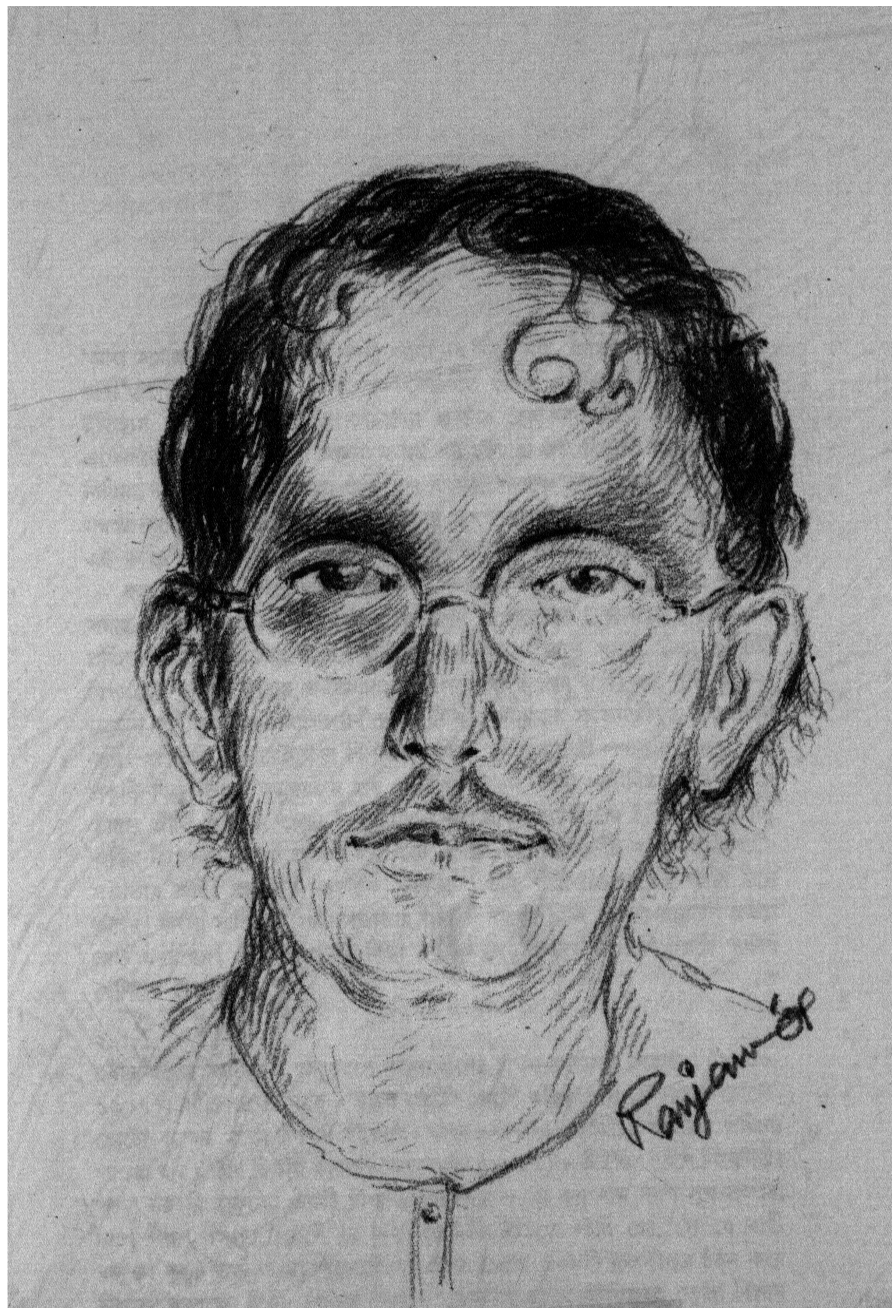
কুমুদরঞ্জন মল্লিকের
শ্রেষ্ঠ কবিতা


Ranjan

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

গোরা সিংহরায়
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।

'আজ সমাজ ধর্মনীতি কিছুরই জন্য আমাদের চিন্তা নাই...আমরা জাতীয় সাধনার ধারা হারাইয়াছি, ইতিহাস ভুলিয়াছি—দেড়-শত বৎসর পূর্বেও যে সহস্র বৎসরের ইতিহাস আছে, তাহার মধ্যে আমাদের জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় কিরূপ...তাহা একেবারে ভুলিয়াছি। এজন্য আমরা স্ব-ধর্ম ভ্রষ্ট হইয়াছি এবং বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্ন বাক্য-সমষ্টির তাড়নায় প্রতি দশ বৎসর, পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া প্রবল মন্বন্তর-মুখে ভাসিয়া চলিয়াছি।'—বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কবি মোহিতলাল মজুমদারের এই উক্তি পরবর্তীকালের অনেক কবি-সাহিত্যিকের পক্ষেও সত্য।

বলা বাহুল্য পৃথিবীর সর্বত্রই দ্রুত যন্ত্র-সভ্যতার বিস্তার এবং মহাযুদ্ধের কারণে সমাজ দ্রুত-পরিবর্তনশীল। কিন্তু সমাজ যখন সরলরেখায় চলে তখনই যে-সমস্ত প্রতিভাধর কবি 'বিশ্বের উপরে হৃদয়ের অধিকার' প্রমাণে সমর্থ, তাঁরা পূর্ববর্তী বিপর্যয়ের মৃত্তিকা থেকে জনসাধারণের উপভোগ্য চিরন্তন সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। তেমনি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের সর্বজনস্বীকৃত এক প্রধান কবি। পল্লীকবি হিসাবেই তাঁর বিশিষ্টতা; কিন্তু, রবীন্দ্রানুসারী পঞ্চকবির মধ্যে তাঁর প্রকৃতি কিছু ভিন্ন। 'কুমুদরঞ্জন শুধু পল্লীপ্রিয় নহেন, তিনি পল্লীনিষ্ঠ। এদিক দিয়া তাঁহার প্রীতি ও নিষ্ঠা প্রগাঢ়।' (সুকুমার সেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।) বস্তুত, অন্তিম বিশ্লেষণে আরও প্রত্যক্ষ করা যায় : তিনি শুধু পল্লীকবিই নন—তিনি পল্লী-সভ্যতার কবি। আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় তিনি পল্লী-সভ্যতাকেই কাম্য মনে করেন। বাংলা সাহিত্যে 'পল্লী-সভ্যতার কবি' হিসাবেই তিনি অনন্য-সাধারণ স্বতন্ত্র্য লাভ করেছেন। এবং এখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

২.

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র অনুকরণে কুমুদরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতদল' (১৯০৬-১৯০৭)। রবীন্দ্রনাথের মতে : 'ইহার ছোটো-ছোটো কবিতাগুলি মৌচাকের ছোটো-ছোটো কক্ষের মতো রসপূর্ণ হইয়াছে। কখনও-কখনও মৌমাছির হুলেরও পরিচয় পাওয়া যায়।' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বনতুলসী' (১৯১১)—শ্রীহরির চরণে নিবেদিত। সূচনা নরহরি ঠাকুরের একটি বিখ্যাত পদ দিয়ে : 'যা কর নাম দরশ সুখ-সম্পদ, দরশ পরশ রসপুর,/পরশে যে সুখ তাহা কি বলিতে পারি গো, সে যে বাণী অনুভব দূর।' ভক্ত ও মহাপুরুষদের তপোবন থেকে ১০৮টি তুলসীপত্র চয়ন করে নিবেদন করেছেন তিনি দেবতার পায়ে : 'তোমারই চরণে আঁখিজলে ভেজা দিলাম এ বনতুলসী।' শতদল ও বনতুলসী মূলত ব্যঙ্গ ও নীতি-কবিতা। নিবিড় আধ্যাত্মিকতায় অভিসিঞ্চিত। অল্প বয়সের রচনা হলেও স্বীকৃতি পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের : 'আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গসাহিত্যে অম্লান শোভায় বিরাজ করিবে।'

পরের কাব্যগ্রন্থ 'উজানি' (১৯১১)। উজানি কবির গ্রামের নাম; পরে নাম হয়েছিল কোগ্রাম। ভূমিকায় কবি লিখছেন : 'ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাস, সামান্য জীবনের সামান্য চিত্র।' গ্রামের মানুষের জীবনের কথা এখানে অতি মমতায় চিত্রিত। বাংলা সাহিত্যে এই কাব্য প্রভূত প্রশংসিত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল উচ্ছ্বসিত হয়ে লেখেন : 'I do desire to see him as one of the greatest poet of the new renaissance in Bengal'.

'একতারা' (১৯১৪) কাব্যের কবিতাগুলি গ্রামের অতি সামান্য ঘটনাগুলির কথা। ভূমিকাতেই কবি সবিনয়ে জানিয়েছেন, 'বিষয় ক্ষুদ্র, কবিও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র একতারাতে বড়ো সুর বাজিবে না, বাজাইবার সামর্থ্যও নাই।'

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'বীথি' (১৯১৫) ও 'চুন ও কালি' (১৯১৬)। 'চুন ও কালি' 'কপিঞ্জল' ছদ্মনামে প্রকাশিত। এর ভূমিকায় কবির নিবেদন : 'মহাশয়, আমার এ চুন ও কালি সকলের জন্য নয়, উপযুক্ত পাত্রের জন্য। যাহাদের গালে লাগিবে তাহারা চটিতে পারে যেন কেহ চটিয়া গালে লাগাইবেন না'। 'চুন ও কালি' একটি ব্যঙ্গ-কবিতার সংগ্রহ—, তারই এই ভূমিকাতেই তা প্রমাণিত।

'বনমল্লিকা' (১৯১৮) প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদর অভ্যর্থনায় ধন্য: 'তোমার বনমল্লিকার কবিতাগুলি যেমন স্নিগ্ধ তেমনি সুন্দর, যেমন সরল তেমনি সরস।' পুস্তকের উৎসর্গ সম্পর্কে কবির উক্তি অভিনব : 'ইহা আমার পূজনীয় প্রিয় একটি বটবৃক্ষকে অর্পণ করিলাম। তাহার ছায়ায় আমি বহু তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।'

'দ্বারাবতী' (১৯২০) একটি তিন-অঙ্কের কাব্য-নাট্য। এখানে ভক্ত অর্জুনের দিব্য-দর্শনে ভবিষ্যতের চৈতন্য-অবতারের একৈক-রূপ।

পরবর্তী কাব্য যথাক্রমে : 'রজনীগন্ধা' (১৯২১), 'নূপুর' (১৯২২), 'অজয়' (১৯২৭), তূণীর (১৯২৮) ও 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮)। রজনীগন্ধার সম্বন্ধে কবির মত: 'রজনীগন্ধার ন্যায় সৌরভ ইহাতে নাই। তাহার মতো ইহা পেলবও নয়, তবে রজনীগন্ধার ন্যায় অন্ধকারে ফুটিয়াছে বলিয়া ইহার নাম রজনীগন্ধা রাখিয়াছি।' 'নূপুর' কাব্যগ্রন্থটি পরম পূজনীয় লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচরণে উৎসর্গিত। 'তূণীর' কাব্যগ্রন্থে মানুষের মালিন্য, ক্ষুদ্র দম্ভ ও অন্যায়ের প্রতি আঘাত, কোথাও মানুষ হওয়ার আহ্বান ও ঈশ্বর-নির্ভরতার প্রকাশ। বৃহৎ মূল্যবোধ কোথাও বিরূপতা, কখনও বা দরদের স্পর্শে অম্লমধুর কাব্যরস সৃষ্টি করেছে।

সোমনাথ মন্দির-সম্পর্কিত গভীর ভক্তি-নিষ্ঠায় সিঞ্চিত ১০৮টি কবিতার বিল্বপত্রের অর্ঘ্য 'গরলের নৈবেদ্য'। এই কাব্যগ্রন্থটি অপ্রকাশিত। কবির সম্পর্কে কালিদাস রায় 'বাউল কবি' কবিতায় লিখেছেন :

'হে রাখাল "উজানি"তে উজিয়ে গিয়ে পৌঁছিলে সেই ব্রজের মাঠে,
"অজয়ে" উজান বেয়ে থামলে গিয়ে নান্নুরে সেই রানীর ঘাটে।
একহাতে 'একতারা' আর পায়ে নূপুর
হে বাউল—গাচ্ছ সদাই ভজন মধুর।
নিতি 'বনমল্লিকা', 'বনতুলসী' ঘেঁটুর অঞ্জলি দাও লোচন-পাটে॥'

৩.

কুমুদরঞ্জন গ্রাম-বাংলার কবি। গ্রামের সেই দেবদেবী, গ্রামের তরুলতা, গ্রামের পশুপক্ষী, গ্রামের লোকজন, গ্রামের নদ-নদী, অজয় ও কুনুর তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য ও প্রেরণার উৎস। গ্রামের প্রতি এই আকর্ষণেই তিনি লিখছেন, 'গ্রাম ছেড়ে কি থাকতে পারি/আমি যে গ্রাম ভুলতে নারি।/আমার মুখে স্তন্য দিল/এ গ্রাম তাহার বুক নিঙাড়ি।' গভীর এই বিশ্বাসে-অনুরক্তিতে তিনি অভিষিক্ত। নিজের এই অনুভবের কথা বলেন শনিবারের চিঠিতে (শ্রাবণ ১৩৪৭): 'প্রাচীন অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষগুলি পল্লীর সম্পদ, তাহাদিগকে আমি গ্রামের সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বুনিয়াদী জীবন্ত অধিবাসী বলিয়া মনে করি। বর্ষায় অজয়ের বন্যা, অন্যসময়ে তাহার লহরীমালার নৃত্য এমনকি তাহার ধূসর বালুচর দেখিয়া আমি ক্লান্ত হই না, দিনের পর দিন দেখি।' এই নিবিড় আসক্তি তাঁর 'অজয়', 'উজানি', 'একতারা', 'নূপুর', 'বনতুলসী', 'বনমল্লিকা'-প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নামকরণে প্রকাশিত। গ্রামের বন্যা-বাদলের সজল স্মৃতি, পদ্মের পরাগ, মালতীর পরিমল, মাটির গন্ধ, ফুলের সুবাস, যূথীর সুরভি, পূজার ধূপের গন্ধ, সানাইয়ের সুর যেন মিশে আছে তাঁর বক্ষে ও চক্ষুজলের সঙ্গে। তাই গ্রাম-বাংলার সহজ-সরল নিরাভরণ উদাস সৌন্দর্যের চিত্র কবি আঁকেন অতি অনায়াস-নৈপুণ্যে। বাংলার লোকজীবন, সংস্কৃতি, তাঁর লেখনীতে সহজ প্রস্ফুটিত। এজন্য তাঁকে ভাবরূপ বা উপমার আশ্রয় নিতে হয়নি। এখানেই তাঁর পল্লী-প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার স্বাতন্ত্র্য এবং গ্রাম-বাংলার রূপমুগ্ধ অসংখ্য কবিকুলের মধ্যে তিনিই সত্যকার 'পল্লীকবি'।

কোগ্রাম চন্ডীমঙ্গলের শ্রীমন্ত সদাগরের বাসস্থান, সতী বেহুলার জন্মস্থান, চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনদাসের জন্মভূমি, বৈষ্ণব ও শাক্ত-সাধনার মিলনকেন্দ্র ও পৌরাণিক বাহান্ন পীঠের অন্যতম। গ্রামে ভক্তির আবহাওয়ায় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ায় শৈশব থেকে তিনি ভগবৎবিশ্বাসী। বারংবার এই বিশ্বাসের কথাই বলেছেন তিনি : 'গ্রামে এত দেবতার বাস যে আমরা মনে করিতাম সবর্দা দেবতাদের চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছি —আমরা তাঁদের আশ্রিত।' স্বয়ং দেবতাকেই বলছেন, 'যেথায় জেনেছিলাম আমি তুমিই কর্তা গৃহস্বামী,/তোমা ভিন্ন করতে হয় না অন্য কারে ভয়।' (যদি : স্বর্ণসন্ধ্যা)। বৈষ্ণব কবিদের মতোই তাঁর এই আত্মনিবেদন: 'সাধক তার ইষ্টদেবতার চরণতলে লুটায় যেমন।' (কবি লেখে কেমন?) বৈষ্ণব ও শাক্ত এই দুই ধারাতেই তাঁর আন্তরিক কাব্য-সাধনা প্রবাহিত।

কুমুদরঞ্জনের দেশপ্রেম, ভারত-সংস্কৃতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ইতিহাস-প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গভীর ভক্তি। তাঁর জাগ্রত ভারত, আমাদের ভারত, বাঙালি, ভারতমহিমা ও সোমনাথ মন্দির-সম্পর্কিত একাধিক কবিতায় তার প্রকাশ। সোমনাথ মন্দিরের লুণ্ঠনের বর্ণনা শৈশবেই কবি-হৃদয়কে ব্যথিত করে। আত্মস্মৃতিতে কবি লিখছেন, 'সোমনাথ সম্পর্কে আমার মর্মবেদনা আমি চোখের জলেও প্রকাশ করতে পারি না। তাহার কথা বলিতে আমি আত্মহারা হই।' সোমনাথ মন্দির সম্পর্কে এই বিনম্র ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মেগাস্থিনিসের সোমনাথ-দর্শন, আলবেরুণীর সোমনাথ-দর্শন, হুয়েন সাঙ-এর সোমনাথ-দর্শন-ইত্যাদি ১০৮টি কবিতায়। আবার এই ভক্তিরসের চরমোৎকর্ষ ঘটেছে 'পুরী-মন্দির' কবিতায়।

৪.

রবীন্দ্রনাথ ও কুমুদরঞ্জনের জীবনদর্শন ও কাব্য-ভাবনায় 'আত্মার-আত্মীয়তা' লক্ষ্য করা যায়। দু-জনেরই ভিত্তি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য; তাই তাঁদের কর্মময় জীবন ও আনন্দময় সত্তার উৎস ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য—ব্রহ্মমুখী ও ভগবৎমুখী। তাঁদের জীবনের অজস্রতার উৎসে রয়েছে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য—মাধুর্য ও প্রেম। মর্ত্যপ্রেমের অমৃত আস্বাদনেও উভয়ের মিল। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ও কুমুদরঞ্জনের 'স্বর্ণসন্ধ্যা'য় দুর্লভ-সার্থক মনুষ্যজন্মের কথা—নৈর্ব্যক্তিক মুক্তির নয়। কুমুদরঞ্জন মনে-প্রাণে খাঁটি হিন্দু। তাঁর প্রার্থনা : 'লভি যদি পুন : মানব-জন্ম, হই যেন আমি হইগো হিন্দু।' সাধনার পথ ভিন্ন হলেও দু-জনের সাধনসিদ্ধির জায়গা এক। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম। কুমুদরঞ্জন অন্যদিকে দেখেছেন : শ্রীহরির প্রকাশ মাতৃরূপে ও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপে। উভয়েই জন্মান্তর ও মৃত্যুর মাঝে অমৃতময় জীবনের অস্তিত্ব এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যে বিশ্বাসী—অন্যায়-অত্যাচার-পাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার। পাশ্চাত্যের কবিকুলের মধ্যে কুমুদরঞ্জনের প্রিয় কবি কিপলিং। কিপলিং-এর ছন্দ-চাতুর্য, ঐতিহাসিক কল্পনা, নীতিবোধ, ভগবৎ-বিশ্বাস ও পরিহাস-প্রিয়তায় তিনি আকৃষ্ট।

৫.

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা-রচনা দেবার্চনার মতো। তাঁরই ভাষায়, 'কবিতা লেখা আমার শখ বা জীবিকা নহে, উহা আমার জীবন। কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না। রূপ-রস-গন্ধহীন হইলেও উহারা দেব-অঙ্গনের ফুল—আপনিই ফোটে, আমি গড়ি না—আর ও সব ফুলই পল্লীজননীর পূজার ফুল।' সমসাময়িক সমমনস্ক কবি কালিদাস রায় প্রত্যক্ষ করেন : সেই সমস্ত 'নানা ফুল দিয়া তিনি পূজা করেন ইষ্টদেবতাকে—তারপর সেই ফুলগুলির প্রতি তাঁর মমতা থাকে না—সেইগুলিকে ভাসাইয়া দেন কালের অজয়-স্রোতে। কোথায় কে সেই প্রসাদী কুসুম তুলিয়া শিরে ধারণ করিল, তিনি তাহার সন্ধান রাখেন না।'

বিশ-শতকের প্রারম্ভে কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা আরম্ভ করে প্রায় সত্তর বৎসর তাঁর অর্চনায় নিমগ্ন ছিলেন কুমুদরঞ্জন। তেরোটি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ এবং একটি অপ্রকাশিত কাব্য ছাড়াও তাঁর আরও অনেক রচনা বহু পত্র-পত্রিকায় বিকীর্ণ। দীর্ঘদিন তাঁর কাব্য-সংকলন অপ্রাপ্য থাকায় অগণিত পাঠকের সঙ্গে আমাদেরও পরিতাপের সীমা ছিল না। পরিশেষে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী অধ্যাপক পুত্র শ্রী কৌশাম্বীনাথ মল্লিক এবং পৌত্র সুখ্যাত কবি শ্রী সুধেন্দু মল্লিকের আন্তরিক আগ্রহ ও সহায়তায় এই সংকলন প্রকাশ সম্ভব হল। কবিতা-প্রেমিক বাঙালি পাঠকের এই সংকলন তৃপ্তিদায়ক হলে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে।

কবিশেখর কালিদাস রায়েব সম্পাদিত পূর্ববর্তী 'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে প্রকাশিত তৎকৃত ভূমিকাটি তাঁর পুত্রগণের উদারতায় এখানে সংযোজিত করতে পেরে আমরা অধিকতর তৃপ্তি বোধ করছি।

২৫ ডিসেম্বর, ২০০১ গোরা সিংহরায়

পরিচায়িকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে আমি যখন দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ঢাকা গিয়াছিলাম—তখন কবিবর মোহিতলাল আমাকে বলেন, "দেখুন, যদি কোনো কবির দেশব্যাপী খ্যাতি হয়,—তা হলে বুঝতে হবে তাঁর লেখার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা দেশের মর্ম স্পর্শ করেছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতা-সম্বন্ধে আমি এতকাল উদাসীন ছিলাম—তাঁর বইগুলো পড়ে আমাকে দেখতে হবে, কি জন্য দেশে তাঁর এত খ্যাতি। নিশ্চয়ই তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে এমন রসবস্তু আছে যা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।"

সাত-আট বৎসর পরে কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "বাংলার মাটি-জল, বাংলার হৃদয়ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যদি এ-দেশের কোনো কবির কাব্যের গভীর সংযোগ না থাকে, তবে তিনি বিশ্বকবি হতে পারেন,—বাঙালির কবি নন। কুমুদরঞ্জন বাংলার আসল কবি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মানসশিষ্যের মুখে আমি এই উক্তিই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

যাহাই হউক, কুমুদরঞ্জন বিশ্বকবি নহেন, বাংলারই আসল কবি। বাঙালিদের জন্যই তিনি কবিতা লিখিয়াছেন।

যে জন্য কুমুদরঞ্জন মোহিতলালের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—ঠিক সেই জন্যই কুমুদরঞ্জন বাঙালির মর্মও গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছেন, আবার ঠিক সেই জন্যই একশ্রেণীর আর্বাচীন পাঠকদের কাছে কুমুদরঞ্জনের কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদা নাই। এই বিমানের যুগে বিশ্ব যাঁহাদের হস্তামলক, বিশ্বসাহিত্য যাঁহাদের নখদর্পণে, কিন্তু যাঁহারা দেহে বাঙালি হইলেও মনে বাঙালি নহেন—তাঁহারা বাংলার যাহা কিছু নিজস্ব সেই সমস্তকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। অবিমিশ্র বাঙালিমনের সৃষ্টি কুমুদরঞ্জনের কবিতার আদর তাঁহাদের কাছে প্রত্যাশা করা ভুল। তাহা ছাড়া, যাহারা সত্যই ঘুমাইয়া আছে, তাহাদের জাগানো সহজ। কিন্তু যাহারা ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া থাকে—তাহাদের জাগানো সহজ নয়। এই প্রকৃতির পাঠকদের কাছে আমার বক্তব্য কিছুই নাই।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার উপাদান, উপজীব্য—সম্পূর্ণভাবে বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা এবং খাঁটি বাঙালির ভাবনা-ধারণা ও সংস্কৃতি হইতে আহৃত।

উপাদান-উপকরণ গৌণ, সাহিত্যসৃষ্টিতে রসই মুখ্য। এই রসসৃষ্টির মূলে আছে প্রেম। এ প্রেম যাহার প্রতিই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষে কোনো কাব্য হয় না—ঔদাসীন্যেও কোনো কাব্য হয় না। প্রেমই কাব্যের

প্রাণস্বরূপ। ইহাকে সহৃদয়তা, হৃদয়াবেগ, দরদ -ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রেম যত গভীর, যত অকৈতব, যত আন্তরিক হইবে—কবিতাও ততো উৎকৃষ্ট হইবে।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে—জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর প্রেম। এই প্রেম কখনও পুরাতন হয় না। ইহা নবনবায়মান। তাই আশির কোটায় আসিয়াও কবির বাঁশি নীরব হয় নাই। কবি তাঁহার প্রেমের পরিসরের বাহিরে কাব্যের উপাদান-বৈচিত্র্যের সন্ধান করেন নাই—ওই প্রেমের ইষ্টধনের মধ্যেই অফুরন্ত বৈচিত্র্য তিনি লাভ করিয়াছেন। প্রতি প্রভাতে তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে নতুন করিয়া অপূর্বরূপে লাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহার জন্মভূমির কথা ফুরাইয়াও ফুরায় নাই, তাহার মধ্যে তিনি অশেষের সন্ধান পাইয়াছেন। কবির প্রাণের কথা আমি নিজের ভাষাতেই বলি—

যারে ভালোবাসি তাহার কথা কি ফুরাতে চায়?
চির পুরাতন, হয়ে হারাধন ফিরে মাতায়।
সে যে নিতি তাজা সে যে নিতি নব নবায়মান,
চির বিচিত্র, হয় কি তাহার লীলাবসান?
নূতন করিয়া তোলে নিতি তারে প্রভাতরবি,
প্রহরে প্রহরে নূতন করিয়া তাহারে লভি।
কত না তাহার রূপ-বিহঙ্গ রচিনু গানে,
অনাবিষ্কৃত কত আছে আজো কেই-বা জানে?
তাহার সীমার মাঝে অসীমার আভাস পাই,
তার পরিচয় তার কথা অফুরন্ত তাই।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার উপভোগ করিতে তাঁহার কবিমানসটিকে আগে বুঝিতে হইবে।

কুমুদরঞ্জনের কবিমানসটি প্রেমাতুর সাধকের মানসের মতো রসগদগদ। এইরূপ কবিমানস ছিল কবিবর দেবেন্দ্রনাথের, আর কতটা ছিল সারদামঙ্গলের কবির। কুমুদরঞ্জন তাঁহাদেরই ধারার কবি। এই মানস কবিতারচনাকালে সম্পূর্ণ রসাবিষ্ট, অন্য সময়ে এই মানস অজ্ঞাতসারে রচনার উপাদান-সংগ্রহে রত। দিনের বেলায় ঘুম ভাঙার পরে শিশুর চোখে যেমন বহুক্ষণ ঘুমের আবেশ থাকিয়া যায়, তেমনি কাব্যসৃজনকালের রসতন্ময়তা অপগত হইলেও, কবির চোখে রসের আবেশ থাকিয়া যায়। সেই রসাবিষ্ট দৃষ্টিতে তিনি সব সময়ই সৃষ্টিকে দেখেন। সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই মানসিক আবিষ্টতার নিরাবচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। সেইজন্য কবি সবসময়ই কেমন যেন উদাসী। Wordsworth ও Burns-এর মতো কুমুদরঞ্জন ইনস্‌পিরেশন্‌ ছাড়া লিখিতে পারেন না—এই ইনস্‌পিরেশন্‌ তাঁহার কবি-মানসে মুহুর্মুহু আবির্ভূত হয়, তাই তাঁহার রচনায় এত প্রাচুর্য।

কবিমানসের মতো কবিমানুষেরও পরিচয় জানা দরকার। এই মানুষটি আকৈশোর কবিতা রচনা করিতেছেন—কিছু মান-যশের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। লেখা শেষ হইলেই যেন তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া যায়। তারপর তাহা নকল

করিয়া নির্বচারে যে-কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দেন। ভালোমন্দ বিচার করেন না, যত্ন করিয়া নকলও করেন না, সেজন্য ছাপায় ভুল হয়। এমন ভুল হয়—যাহাতে কবিতার রসের হানি হয়, তবু তাহাতেও কবির ভ্রূক্ষেপ নাই, রাগ নাই, ক্ষোভ নাই। আবেগের তাড়নায় যাহা কলমে আসিল তাহাই থাকিয়া গেল, দ্বিতীয়বার সংস্কার বা মাজাঘষা একেবারেই করেন না। যৌবনকালে নিজের খরচে কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ ছাপিয়াছিলেন—তারপর আর বই ছাপিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দিন লেখনীকে অবকাশ দেন নাই। তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর একটি কপিও তাঁহার কাছে নাই, যাহা ছিল মোহিতলালকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কুমুদরঞ্জনের কবিতা রচনা দেবার্চনার মতো। নানা বন্যফুল দিয়া তিনি পূজা করেন ইষ্টদেবতাকে—তারপরে সেই পুষ্পগুলির প্রতি আর তাঁহার মমতা থাকে না—সেগুলিকে ভাসাইয়া দেন কালের অজয় স্রোতে। কোথায় কে সেই প্রসাদী কুসুম তুলিয়া লইয়া শিরে ধারণ করিল তিনি তাহার সন্ধানও রাখেন না।

জন্মভূমির প্রতি প্রেম তাঁহার এতই গভীর যে, সে প্রেমকে অবুঝ বালকের অন্ধ মমতা বলা যাইতে পারে। বার বার অজয় তাঁহার ভদ্রাসনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তবু সেই অজয়তীর তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। বিগত বন্যায় অজয় তাঁহার ঘরবাড়ি সব নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাসাইয়া গলাইয়া তলাইয়া দিল—তিনি তাঁহার ভিটায় তাঁবুতে বাস করিতে লাগিলেন—তবু পুত্রপরিজনদের আবেদন-নিবেদনেও অজয়তীর ছাড়িয়া গেলেন না।

কুমুদরঞ্জনের রসসৃষ্টির কথা বলিতে হইলে তাঁহার রসদৃষ্টির কথাও বলিতে হয়। কুমুদরঞ্জন যেন তৃতীয়-নেত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রের দৃষ্টি দিয়া তিনি সৃষ্টিকে দেখেন, তাই সৃষ্টির সকল অঙ্গে অসামান্যতা ও অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পান। যে সকল তুচ্ছ বস্তুতে আমরা কোনো সৌন্দর্য বা মাধুর্য পাই না, কবি তাহাতে যেন তাহাই খুঁজিয়া পান। তাঁহার আরাধ্য কবি Wordsworth-এর ভাষায় তিনিই বলিতে পারেন—

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

যত অল্পজ্ঞাত রক্তমাংসে তাজা মানুষ, যত নগণ্য জীবজন্তু বৃক্ষলতা সবই তাঁহার রচনায় গৌরবাসন লাভ করিয়াছে। বড়ো বড়ো সুখ-দুঃখের কথা অনেকেই লিখিয়াছেন—কিন্তু ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখ তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। কবি কিন্তু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকরেরেই দরদী। তুচ্ছ ক্ষুদ্র যাহা কিছু তাহাই তাঁহাকে ভাবাকুল করিয়া তোলে। কবিগুরু লিখিয়াছিলেন—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।

এই শিশিরবিন্দুটি যিনি প্রতি প্রভাতে দুয়ার খুলিয়াই দেখিতে পান—তিনি এই কুমুদরঞ্জন। এইখানেই কবিদৃষ্টির মৌলিকতা।

কুমুদরঞ্জন সচেতন শিল্পী কবি নহেন, তাঁহার রসসৃষ্টির মূলে কোনো কষ্টকল্পিত কলা-কৌশল নাই। প্রধানত তিনি একটি উদ্দীপন বিভাবের দুর্নিবার তাড়নায় একটি হৃদয়াবেগকে রসমূর্তি দেন—কোনো কলাকৌশলের সহায়তার জন্য প্রতীক্ষা করেন না। ওই হৃদয়াবেগই কতকগুলি উৎপ্রেক্ষা, উপমা, নিদর্শনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বচ্ছন্দাগত, এইগুলির একটিও উচ্ছিষ্ট নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত গভীর পবিচয়ই ভাবতের পুরাণ, প্রাচীন কাব্য, ইতিহাস হইতে তাঁহার লেখনীর মুখে এইগুলি যোগাইয়া দেয়।

অনেক সময় রজনীগন্ধা গাছের দীর্ঘ দণ্ডের শীর্ষে দুইটি ফুলের মতো কবিতার শেষ দুইটি চরণের উৎপ্রেক্ষা, সূক্তি বা আভাণক কবিতাকে সার্থক করিয়া তোলে।

এইগুলিকে ঠিক organic growth-এর কবিতা বলা যায় না। এইগুলি হইল একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কবিতা। অন্য নানা শ্রেণীর কবিতা আছে—যে সকল কবিতায় কবি কোনো হৃদয়াবেগ কিংবা কোনো ভাব বা ভাবপরম্পরাকে ক্রমোন্মেষ দান করিয়াছেন—সেগুলিতে organic growth বেশ সুস্পষ্ট। অনেক সময় কবি তালিকাকেই মালিকায় পরিণত করিয়াছেন। কবি হৃদয়াবেগের তাড়নাতেই প্রধানত কবিতা রচনা করেন,—কোনো ভাবকে বহু দিন ধরিয়া লালন করেন না, সেজন্য কোনো কোনো কবিতাকে সুপরিণত সৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না।

চেষ্টা করিয়া কলাকৌশলসৃষ্টির প্রয়োগ না করিলেও কবির রচনায় অলংকারের প্রাচুর্য দেখা যায়—অথচ একটিও গতানুগতিক নয় একথা পূর্বেই বলিয়াছি। আর একটি কথা—এইগুলি এমনভাবে রচনার ভাষার সঙ্গে সমন্বয় লাভ করে যে মনে হয় না—এইগুলিতে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা আছে। এইগুলি মাধবীলতায় ফুলের মতো স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে।

উৎপ্রেক্ষা, উদ্‌ঘাত (allusiveness) ইত্যাদি ছাড়া শ্লেষ, ব্যঞ্জনা, বক্রোক্তি ইত্যাদিও কবির রচনায় প্রচুর। 'গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড'-এর মতো অনেক রচনায় একটা কৌতুকরসের ধারাও চলিতে থাকে।

এই যুগের বিচারে কুমুদরঞ্জনের একটি অপরাধ তিনি ভক্তকবি। ভক্তি বস্তুটি এ যুগে উপহাস্য। ভক্তি যে প্রেমেরই একটি রূপ, প্রেম যে পুষ্প, আর ভক্তি যে তাহার ফল, এ-কথা অনেকে ভুলিয়া যান। এই প্রেম কেবল তাঁহার অভীষ্টদেবের প্রতি নয়—যাহা কিছু মহৎ, সৎ, পবিত্র, সুন্দর ও অপূর্ব কবির প্রেম তাহারই প্রতি। দেশে দেশে যুগে যুগে—শত শত কবি ভগবানের প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন, কবি তাঁহাদেরই দলের একজন। ইহাতে যদি তাঁহার অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা হউক। রসবিমুখ পাঠকমহাশয়দের চেয়ে ভগবান ঢের বড়।

গভীর ভক্তি যে কবিতায় রূপ লাভ করিয়াছে, অন্যে তাহার অনাদর করিতে পারে, দেবী সরস্বতী তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবেন।

কবির চোখে এই সৃষ্টি আজিও পুরাতন হয় নাই। সে জন্য কবি আজিও প্রকৃতির পানে চাহিয়া—

যাহা ছিল চির পুরাতন
তারে পান যেন হারাধন।

কাজেই বিস্ময়ের আবেশ আজও তাঁহার ফুরায় নাই। ফলে, তাঁহার অনেক কবিতা অদ্ভুতরসের। আর কারুণ্যরসের ফল্গুধারা বহু রচনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, 'প্রত্যাবর্তন'-এর মতো কবিতায় তাহা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

বাউল বৈরাগীদের অঞ্চলের মানুষ, সাধক কবি লোচন দাসের পাটের প্রহরী—এই কবির রচনায় বৈরাগ্যের সহজিয়া সুর ধ্বনিত। কবির সংগীতের সঙ্গে বেণু বীণা ঢাক ঢোল বাজে নাই—বাজিয়াছে গোপীযন্ত্র আর গাবগুবাগুব।

কবির স্বদেশপ্রেম ও ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি সম্মিলিত হইয়াছে সোমনাথ প্রসঙ্গে লিখিত শতাধিক কবিতায়। সেগুলির তিন-চারটির বেশি বর্তমান সংকলনে গ্রহণ করার সুযোগ হয় নাই।

কবির রচনাভঙ্গি এত অনুদ্ধত, সুকুমার, শান্তশুচি, স্নিগ্ধ ও কমনীয় যে এই যুগের দ্রুতচারী আত্মাভিমানি উদাসীন পাঠকের চোখে পড়িবার কথা নয়। কবি তো কোথাও আস্ফালন বা আড়ম্বর করিয়া শ্রোতাদের আহ্বান করেন নাই। চোখে অঙুল দিয়া কাহাকেও কিছু দেখানো বা আঙুলের খোঁচা দিয়া কাহাকেও চেতাইয়া কিছু শোনানোর অভ্যাস এ কবির নাই।

ইদানীং কাব্য-বিচারে ইতিহাস-সচেতনতা ও সমাজ-সচেতনতা এই কথা দুইটির খুব প্রয়োগ দেখি। ইতিহাস বলিতে শুধু স্বদেশ-বিদেশের পুরাবৃত্ত বুঝায় না, পুরাণও ইতিহাস, নিজের গ্রামেব ইতিহাস, নিজের বংশকূলের ইতিহাস, জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকেও বুঝায়। সে হিসাবে সোমনাথের কবির রচনায় ইতিহাস-সচেতনতা প্রচুর। আর, সমাজ বলিতে কেবল তো ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, নগরের সৌখিন সমাজ, চা-কফির টেবিলের বা কলেজের লেকচারারদের বিশ্রামকক্ষের টেবিলের চারিপাশের সমাজ, শ্রমিক নেতাদের সমাজ বা কোনো রাজনৈতিক সমাজকেই বুঝায় না,—যে সমাজে কবি জন্মগ্রহণ করিয়া পালিত বর্ধিত হইয়া চিরজীবন বাস করিতেছেন—তাহাই কবির পক্ষে আসল সমাজ। সে হিসাবে কবির কাব্যে সমাজ-সচেতনতা খুবই প্রখর। এক সমাজের কবির পক্ষে অন্য সমাজের সচেতনতা থাকাই অস্বাভাবিক।

কবির কোনো পুস্তক দীর্ঘকাল ধরিয়া পুঁথির হাটে পাওয়া যায় না। সে যুগে কয়েকটি গ্রন্থ কবি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন—সে যুগ আর নাই। দুইটি রুধিরনদী দুই যুগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সে সকল গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করিয়া লাভ নাই। এই সংকলনগ্রন্থের কবিতাগুলি সেই সকল গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত হইল এবং নূতন কবিতাও তাহাতে সংযোজিত হইল। এই গ্রন্থে যতগুলি কবিতা প্রকাশিত হইল তাহার পাঁচগুণ কবিতা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় থাকিয়া গেল।

কবির উদ্দেশে রচিত একটি কবিতা দিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি—

যেথায় কুনুর তীর্থ রচেছে অজয়সঙ্গ লভি
সেথা আশ্রম রচি জপ করে এ-যুগের ঋষি কবি।
তার সুখময় ভবনাশ্রয় করেছে অজয় গ্রাস
তবু তারে আরো ভালোবাস বারো মাস।

অজয়ের কলতানে।
সেথা কেঁদুলীর কোমল কান্ত পদাবলী শোনে কানে।
নানুরের ঘাটে রামী রজকিনী আজিও কাপড় কাচে,
তালে তালে তার ধ্বনি সে কবির শ্রবণকুহরে নাচে।
বর্ষে বর্ষে বর্ষা বন্যা হানে,
কবির দুয়ারে ভাবের বন্যা প্রেমের বন্যা আনে।
ডাক দিয়ে যায় অনন্ত পানে ফেনিল উর্মিকুল
সে ডাক শুনিতে কবির হয় না ভুল।
যবে তরঙ্গ-তুরঙ্গচয় বহি আনে রাজরথ,
আগুলিয়া তার পথ
শীর্ণ পাণিটি তুলি ঋষি কবি কয়,
আশ্রমমৃগ বধ করিও না, এ তব বধ্য নয়।
চারিপাশে শ্যাম তরুলতাগুলি রচে শান্তির ছায়া,
কবির নয়নে ঘনাইয়া তোলে বৃন্দাবনের মায়া।
'লোচন' তাহার তৃতীয়-লোচন করিয়াছে বিমোচন,
চণ্ডীর কৃপা করিয়াছে তার চিত্তেরে বিশোচন।
বঙ্গমাতার দরদী হৃদয়খানি।
তাহার জীবনে মূর্ত দেখিয়া পরম ভাগ্য মানি।
রাঢ়ের মাটির ইক্ষুর মতো মধুর লেখনী তার
পেষণে তাহার রস ঝরে অনিবার!
লুপ্ত হয়নি রাঢ়-বঙ্গের সংস্কৃতির ধারা
তাহার হৃদয়-গোপীযন্ত্রে যে পাই যেন তার সাড়া।
মাঠের কুসুম কবিতা তাহার, হাটের পণ্য নয়,
অনধিকারীর বিলাসলীলার ভোগের জন্য নয়।
কবিতা তাহার গোবিন্দজীর তুলসী-বাসিত ভোগ,
ঘুচায় মনের গ্লানি পাপ তাপ রোগ।
কবিতা তাহার নরোত্তমের ঝুলি
তার মাঝে পাই ব্রজ বাসন্ত হোলির রঙিন ধুলি।
কবিতা তাহার নাটমন্দিরে বাতাসা হরির লুট,
তারি লাগি পূবা অর্ধ শতক পেতে আছি করপুট।
কবিতা তাহার কুললক্ষ্মীর ঝাঁপি,
শিয়রে রাখি তা নির্ভয়ে মোরা দুর্যোগ রাতি যাপি।
কবিতা তাহার বাংলা-মায়ের হৃদয়মথিত ননী।
আশীর কোটায় আসিয়াও তার থামেনি বাঁশির ধ্বনি।
কাল-কালিন্দী-জলে
কবিতা তাহার প্রসাদী কুসুম অসীমে ভাসিয়া চলে।

সূ চি প ত্র

শতদল (১৯০৬/১৯০৭)

বন তুলসী (১৯১১)

উজানি (১৯১১)

একতারা (১৯১৪)

বীথি (১৯১৫)

চুন ও কালি (১৯১৬)

তূণীর (১৯২৮)

স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮)

গরলের নৈবেদ্য (অগ্রন্থিত-কবিতা)

শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৭)

কাব্যসম্ভার (১৯৬৭)

কুমুদ-কাব্যমঞ্জুষা (১৯৮১)

হিংসা

বুড়া বক শুনি পাপিয়ার মধু-গান,
বলে এরি লাগি এর এতই সম্মান।
ওর চেয়ে ভালো গান কত দিনে রেতে
গাওয়া গেছে ও বয়সে পথে যেতে যেতে।

সঙ্কীর্ণতা

বলিছে কুয়ার ব্যাঙ বাহিরেতে গিয়া
দেখিবার কি বা আছে বল দেখি ভায়া।
যাহা নাই এ কুযাতে নাহি এ ধরায়
আমাদেরি একজন বলে গেছে হায়।

বাচাল

আরশোলা বলে টিয়া তুমিও যেমন
জাতিভেদ মানা আর চলে না এখন।
আমরা বিহগ কুল এক হলে হায়
সাম্য, মৈত্রী, একতায় বাঁধিব ধরায়।

মূর্খ

গাধা বলে আমি দাদা দেখিয়া অবাক
বুঝিল না জীব মোর সুগম্ভীর ডাক।
গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব, গভীরতা তার,
শুনিল না পোড়া দেশ বুঝা কোন্ ছার।

ঘোর বিশ্বাসী

পণ্ডিত বলেন শুন হে বৈষ্ণব ভায়া
ডাকিলে কি হরি আসে. যায় তারে পাওয়া?
বিশ্বাসী বৈষ্ণব বলে পণ্ডিত গোঁসাই
ডাকিলে আসে না হরি একি বল ছাই।
কোকিলের ডাকে দেখ আসে উষারানী,
চাতক ডাকের বলে জল আনে টানি।
ঝিঁঝি-র ডাকেতে যদি আসে বিভাবরী,
আমার ডাকেতে কেন আসিবে না হরি।

মহাপ্রাণ

ইক্ষু বলে কল তুমি সুহৃদ আমাব
তোমার পীড়নে বহে মোর সুধাধার
স্বর্ণ বলে অগ্নি কেন লাজ পাও তুমি
বিশুদ্ধ তোমারি স্পর্শে হইয়াছি আমি।
ধর্ম কহে দুখ তুমি পরম মঙ্গল
তোমারি দহনে আমি হয়েছি উজ্জ্বল।

সৎসঙ্গ

কৌটা বলে হে কস্তুরি ভাবি দিবা যামি
কত পুণ্যে তব সঙ্গ লভেছিনু আমি।
চলে গেছ, সুরভিতে তবু বক্ষ মোর
ভুর ভুর করিতেছে, ওগো চিত্তচোর।

কুসঙ্গ

পতঙ্গ বলিছে অগ্নি মুহূর্তেক তরে,
তোর কাছে গিয়া মোর পক্ষ গেল পুড়ে।
ক্ষণিক আমোদ তরে হারালাম যাহা
জীবনের বিনিময়ে যায় না তা পাওয়া।

বাক্য ও কার্য

বাক্য বলে আমি বড় কার্য বলে হাসি
আমি জল, তুমি মোর শুভ্র ফেন রাশি।

জাতীয়তা

জলহস্তী বলে হাসি প্রবালে ডাকিয়া,
এত প্রাণ ডারি দাও কিসের লাগিয়া?
প্রবাল বলিছে ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়ে বলি,
সুন্দর প্রবাল দ্বীপ মোরা গড়ে তুলি।

লোকহিত

মুমূর্ষু ভ্রমরে ডাকি শুধাইছে যম
এখনো গড়িছ কেন নব মধুক্রম।
ভ্রমর বলিছে হেথা আসিবে যে পরে,
যা পারি রাখিয়া যাই তারি তরে গড়ে।

বই-পড়া জ্ঞান

বিদুষী মহিলা পাক প্রণালী পড়িয়া
বলেন রন্ধন সব ফেলেছি শিখিয়া,
বই পড়ে বুঝিলাম এতদিনে আজ
রন্ধন সবার চেয়ে অতি সোজা কাজ।
দিনেক রন্ধনশালে রাঁধিবারে গিয়া
এলেন কেবল মুখ হাত পোড়াইয়া।

জীবে দয়া

বলেন ডাকিয়া ভক্ত অবোধ শিশুরে
দলিত কোরো না ওই ক্ষুদ্র পোকাটিরে।
জগতের শত শিল্পী শত যত্ন করে,
ওর চেয়ে ক্ষুদ্র কীটও সাধ্য নাই গড়ে।
ঈশ্বরের প্রয়োজন গড়িতে যাহায়
তাহারে নাশা কি বাছা তোর শোভা পায়?

বিস্ময়

শিল্পকর বলে সদা আমি ভেবে মরি
কি বিরাট কি নিপুণ শিল্পী তুমি হরি।
যে হাত গড়েছে অভ্রভেদী হিমালয়
অদৃশ্য অণুকা তারি গড়া সমুদয়।
জলদের গায়ে যাহে আঁক হে বিজলি
তাতেই কুসুম দলে টান রেখাগুলি।
অপূর্ব তুলিকা যাহা রাঙায় গগন
ছোট প্রজাপতি পাখা সাজায় কেমন।
অতি ক্ষুদ্র তৃণে তব হেরি কারিগরি
বিস্ময়ে পুলকে চক্ষু জলে উঠে ভরি।

মহাকবি

মহাকবি বলে, হেরি মূক মোব বাণী
কি জীবন্ত মহাকাব্য এই বিশ্বখানি।
কি লালিত্য, অলঙ্কারে, অর্থের গৌরবে,
সর্ব রস সমাবেশ, তুল্য নাহি ভবে।

এক মহাকাব্য অনবদ্য, অনাবিল,
অমিলের মাঝে নিত্য কি সুন্দর মিল।
কি আশ্চর্য প্রতি ছত্রে প্রত্যেক অক্ষরে
করুণা বারিধি কবি নিজে ধরা পড়ে।

বদ্ধ ও মুক্ত

মরাল বলিছে, বক এস মোর সাথে
যাইবে মানস সরে নব বরষাতে।
মরকতে বাঁধা তট, নমেরুতে ঢাকা,
সমীরণ নীলোৎপল পরিমল মাখা।
মরাল যূথের সাথে করিবে ভ্রমণ,
মধুর মৃণাল তুলি করিবে ভক্ষণ।
নাহি ক্লেশ, নাহি দুঃখ, নিষাদের ডর,
পুলকে ভ্রমিবে নীল জলের উপর।
বক বলে, সেথা গিয়া কি হইবে ভাই
গুগলি কর্দম কীট সেখানে যে নাই।

প্রকৃত সাধক

সংগ্রামী সংসারে থাকি হিংসা-দ্বেষহীন
হৃদিখানি থাকে সদা হরিপদে লীন,
স্বার্থশূন্য, পরহিতে রত যাঁর মন,
সেই পঞ্চতপা তাঁর গৃহ তপোবন।

শিশুর সুখ

দূরে উচ্চ তাল গাছে হেরি শিশুকালে
ভাবিতাম স্বর্গ ছোঁয়া যায় সেথা গেলে,
জ্ঞানের সহিত দেখি পাপও গেছে বেড়ে
কাছের সে স্বর্গ মোর গেছে বহুদূরে।

সংযম

ঝটিকা সংযত হয়ে হলে সমীরণ,
কুসুম সুরভি তবে করে বিতরণ।
নদীর উদ্দাম স্রোত হইলে সংযত,
তবে হ্রদে পূর্ণশশী হয় সে বিম্বিত।
সংযম পবিত্র হলে, হইলে নির্মল,
জাগে হৃদে শ্রীহরির মুরতি বিমল।

কবিরাজ

হারায়ে চোখের কাছে জামাতারে আজ
কাঁদিছেন ধন্বন্তরী-কল্প কবিরাজ।
বলেন, আমি যে কিছু করিতে না পারি,
তাহাই দেখায়ে দিলে ওহে দর্পহারী।
হৃদে যে লেগেছে ব্যথা, শত প্রলেপেতে
সাধ্য নাই কণামাত্র তাও কমাইতে।
তুমি রাখ, তুমি মারো জানিনে কি লাগি
আমারে করহ হরি নিমিত্তের ভাগী।

মহৎ চরিত

উদয়ে লোহিত রবি অস্তেও লোহিত,
সুখে দুখে একরূপ মহৎ চরিত।

ভ্রম

ঈশ্বর না মানি যেই শাস্ত্র নানা পড়ে,
বীজ না রোপিয়া সে তো শুধু চষে মরে,
হৃদয়ে হয় না বিন্দু আলোক সঞ্চার,
ফুঁপাড়িয়া মরে, মাত্র ধোঁয়া লাভ তার।

সাধু ও গৃহী

সাধুরে জিজ্ঞাসে বক, এই গঙ্গাতটে
প্রভাতে সন্ধ্যায় দোঁহে বসে থাকি বটে।
আমি তো তোমারি মতো থাকি চোখ বুজে
কই তো হরির কিছু পেলাম না খুঁজে।
সাধু কন, চোক বোজ, মনে থাকে তব,
আসিবে শিকার কবে ছোঁ মারিয়া লব।
ও নহে হরির লাগি তব চোক বোজা,
ও কেবল মনে মনে মৎস্য কীট খোঁজা।

সংজ্ঞা

সৌন্দর্য—বিশ্বেতে তাঁর পুণ্য করলেখা,
প্রেম—সে সৌন্দর্য মাঝে নিত্য তাঁরে দেখা,
প্রীতি—রূপ হেরি তাঁর হওয়া অনুরাগী,
ভকতি—উৎকণ্ঠা হরি-মিলনের লাগি।

কর্তব্য

কোকিল বলিছে সদা তাঁর নাম গাই
তবু কেন হৃদে মোর শান্তি নাহি পাই।
সারসী বলিছে কর কর্তব্য লঙ্ঘন,
করো না যে তুমি স্বীয় সন্তান পালন।
মাতা হয়ে তনয়ে যে না করে শিক্ষিত,
জগৎ-জননী স্নেহে হয় সে বঞ্চিত।

হংস খেয়ারী

তার সে ছোট কুটিরখানি অজয় নদীর পারে
ছোট ছোট শিশুর গাছ জাগছে চারি ধারে।
বসলে আঙিনায়
ক্ষেতটি দেখা যায়
ছুটে ছুটে ভেড়ার পাল আসে তাহার দ্বারে।

২

তরু লতার রাঙা ফুলে চালটি আছে ঢেকে
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটি গায়ে মেখে।
নদীর কালো জল
করলে টলমল
হাঁসগুলি তার হেলেদুলে ডাঙায় আসে বেঁকে।

৩

দুপাট ডোঙায় একা কেবল যাত্রী করে পার
আটটি জনের বেশি কভু নেয় না সে তো ভার।
ঝিঙে কচু পুঁই
ভাবে কোথা থুই
হাটের লোকে আঁজুল আঁজুল দেয় যে পুরস্কার।

৪

মামলা মোকর্দমা আর ধরার কোলাহল
পায় না সে তো শুনতে বিনা নদীর কলকল!
শুধু গঙ্গাস্নানে
যায় 'কাটোয়া' পানে
আদালতের নামে তাহার চরণ টলমল।

৫

চণ্ডী মায়ের সোনার 'কোগাঁ' তার বুকেতে থাকে
ভোরে উঠে লোচন দেবের চরণধুলা মাখে।

গাজন উজানিতে
হৃদয় উঠে মেতে
সুখে দুখে মঙ্গলারে হৃদয় ভরে ডাকে।

আম গাছ

দুখিনীর ছিল শুধু একটি আমের গাছ
নিজ দুয়ারের কাছে তার।
বছর বছর তাতে গাছ ভরা আম হত
ছেলেরা কুড়াত অনিবার।
একদিন কুপ্রভাতে ছেলেরা দেখিল তার
দু-জন কুঠার লযে করে
চারিদিক ঘুরি ঘুরি দেখিছে গাছের মূল
বালকেরা শিহরিল ডরে।
ছুটিয়া মায়ের কাছে কাঁদিয়া বলিল গিয়া
দেখ মাগো কাহারা আসিয়া,
দু-খান কুঠার লয়ে দেখিছে গাছের গোড়া
লয়ে যাবে বুঝি বা কাটিয়া।
আমাদের চারাগাছ মুকুলেতে ছেয়ে আছে
এ বছর কত আম হবে
আমরা খাব না আম, তারা সব নিয়ে যেয়ে
গাছটি কাটিবে কেন তবে?
মলিন বদনে মাতা বলিল, তা শুনিবে না
তোমরা বাড়িতে এস ধন,
ধারের দায়েতে কত রাজার রাজত্ব যায়
মহাজন শোনে না বারণ।
গরিবের ছেলে মেয়ে বাহিরে গেল না আর
খেলাঘরে বসিল উঠানে,
কুঠারের ঘা যেমন গাছের গোড়ায় পড়ে
চাহে এ উহার মুখপানে।
খেলাতে বসে না মন কানে যে পশিছে সাড়া
বাজিছে কোমল বুকে কত,
নিষেধ করেছে মাতা বাহিরে যাবে না আর
বসে আছে পুতুলের মতো।

আর কতখন হায় গাছ নোয়াইল শির
শিশুদল চাহিয়া রহিল।
ভূতলে পড়িল তরু তারি সাথে আঁখি কটি
জলভারে নামিয়া পড়িল।
গাছের তলাতে শুধু ভাঙা খেলাঘর আছে
একটিও প্রাণী নাই সেথা,
পড়ে আছে ভ্রষ্ট নীড়, গেছে উড়ি পাখিগুলি,
পথিকের হৃদে দিয়ে ব্যথা।
একি আশা, একি ভ্রম মায়ার ছলনা একি
আজও দুটি ছোট ছোট ছেলে,
প্রভাতে উঠিয়া ওগো ঘটি ভরে জল দেয়
কাটা সেই প্রিয় তরু মূলে।

অখিল মাঝি

অজয়ের বুকে সারাদিন, সারাদিন তরী বাহে,
সন্ধ্যাবেলায় আঙিনায় জাল বুনে আর গাহে
সুখে আছি আমি হরি হে অভাবেরে আমি ডরিনে,
আমার হিংসা করেনাকো কেউ আমিও হিংসা করিনে।

২

চাঁদ দেখে তারে প্রথমে, সম্ভাষে আগে রবি,
কোকিলের ডাকে জাগে সে প্রগাঢ় শান্তি লভি,
ধরে পাড়ি আর গাহে গান হরি কারো ধার ধারিনে।
কাহারো মন্দে থাকিনেকো আমি কাহারো হিংসা করিনে!

৩

যবে মন্দিরে বাজে শঙ্খ সন্ধ্যা ঘনায়ে এলে,
দাঁড় থামায়ে সে ক্ষণ-কাল রহে দুটি বাহু তুলে।
শরীরেতে তার নাহি রোগ দেহে লাগে বটে কাদা,
বন টগরের মতো তার হৃদিখানি রহে সাদা।

৪

একদা গ্রামের জমিদার কন তরী হতে নামি
জগতের মাঝে শুধু তোর হিংসা করি রে আমি

জমিদারি দিয়ে ডিঙিখান নিতে সদা আছি রাজি,
বিনিময়ে তোর মতো প্রাণ পাই যদি ওরে মাঝি।

আদুরী

ওরে ওই দেখ্ পড়িয়াছে বান অজয়ে,
ঘাট মাঠ বাট সব দিল আজ ডুবায়ে,
থাকি থাকি দেখ্ চমকি উঠিছে বিজুরি,
হাঁসগুলি তোর ডেকে নিয়ে আয় আদুরী।
মার কথা শুনে ছুটিল কৃষক বালিকা,
সে যে সোহাগিনী দয়াবতী পশুপালিকা।
পদ্মদীঘির পদ্মের হেরি মাধুরী
তি তি করে তার হাঁসগুলি ডাকে আদুরী।
বালিকা চকিতে দেখিল নিকটে আসিয়া,
বন্যার জলে হাঁসগুলি যায় ভাসিয়া।
হংস ধরিতে লাফায়ে পড়িল দুলালী,
পদ্মদীঘির যেন সে স্বর্ণমরালী।
আর হাঁস লয়ে কই সে এল না ফিরিয়া,
বাপ মা তাহার কেঁদে খোঁজে গ্রাম ঘুরিয়া।
দেখে সবে হায় পরদিন সেথা আসি যে,
পদ্মের মাঝে সে মুখকমল ভাসিছে।

পথে

'প্রহরী রয়েছে দ্বারে, সুন্দর বাড়িখানি—
ওই যে জাগিছে পাশে—মনে হয়, চিনি চিনি।
কত গ্রাম পার হয়ে আমরা তো আসি যাই,
তার মাঝে এইখানি কেন ভালো লাগে ভাই?'
বুড়া ভৃত্যের সাথে কথা কহে ধীরে ধীরে,
চলিছে একটি শিশু ছাতিটিও নাই শিরে।
বুড়া বলেনাকো কথা সে যে ভালো করে জানে
কার ছিল ওই বাড়ি কারা ছিল ওইখানে।

আজি হেন দীনবেশে কে যে সাথে যায় হেঁটে,
বুড়া তো সকলি জানে বুক তার যায় ফেটে।
তার সে জনম দিনে উৎসব রোশনাই,
শিশু যেতে পারে ভুলে, ভিখন তো ভোলে নাই।
দারুণ নিয়তি ফেরে পর হয়ে গেছে বাড়ি,
কমলা বিমুখ আজ বিকায়েছে জমিদারি।
তবু শালোগু৷ গ্রাম রায়দের নামে গাঁথা,
তাঁদের তনয়ে হেরি কে না পাবে বল ব্যথা?
প্রণমিছে দুই পাশে গ্রামবাসী হেরি তায়,
বুঝিতে না পারি শিশু ভিখনের পানে চায়।
কপালেতে দেয় হাত কাতর ভিখন আজ,
শত দুখ-আলাপন হয়ে যায় তারি মাঝ।
জানিনে বুঝিল কিনা শিশু এ সবার মানে—
কই একটিও কথা পশেনি তো তার কানে?
গ্রাম পার হয়ে শুধু বালক বলিল, ভাই,
চোখেতে পড়েছে কুটা দেখ, জল আসে তাই।'
বুড়া বলে 'ওরে শিশু, কে তোরে শিখাল ছল—
আয় দাদা, আয় কোলে, কাঁদিলি কেন রে বল্?'
'কই কাঁদি নাই আমি' শিশু বলে বার বার,—
বুড়া নিজ আঁখিজল থামাইতে নারে আর।

শরাহত কপোত

নদী তীরে একা ভ্রমিতে ছিলাম একদা ফাগুন প্রাতে,
দেখিনু কপোত সমুখে পতিত-নিষাদের শরাঘাতে।
কাতরতা মাখা রাঙা আঁখি দুটি, ম্লান চাহনিটিতে তার,
যাতনা মথিত, ধূলি লুণ্ঠিত, সে কোমল দেহভার।
দিনু গায়ে হাত, বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি,
পিয়ে মরণের কূট হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি।
তার সে চাহনি যে কথাটি হায় কয়ে গেল মোর প্রাণে,
অর্থ তাহার পাইনে খুঁজিয়া বিশ্বের অভিধানে।

কৃষ্ণা রজনী

বুঝি সেদিন সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর ঝটিকা মুখর চারিধার।
সতী সাবিত্রী মৃত পতি কোলে
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে,
শিয়রে শমন কত কথা বলে
দমকে দামিনী বারেবার।
বুঝি সে দিনও সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার।

২

বুঝি সে দিনও এমনি গুরুগর্জন অবিরল,
মত্ত পবনে বরুণ রাজ্য টলমল।
গাঙুরের নীরে ভাসাইয়া ভেলা,
মৃতপতি দেহ আবরি বেহুলা
চলে অসহায়া একাকিনী বালা
ঝরে নিশিদিন আঁখিজল,
বুঝি সে দিন এমনি গুরুগর্জন অবিরল।

৩

বুঝি সে দিনও এমনি ঝলসে বিজলি খনেখন
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে অনুখন।
বারানসী ধামে গঙ্গার তীরে,
ধূলি লুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে
চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে
মৃত পুত্রের সে বদন,
বুঝি সে দিনও এমনি ঝলসে বিজলি খনেখন।

৪

বুঝি সে দিনও এমনি জলের কাতর কলকল,
বন মর্মরে ভীত চকিত মৃগদল।
দময়ন্তীরে ফেলি বনমাঝ
কোথা পলাইয়া গেল নলরাজ,
কাঁদে রাজবধূ অনাথিনী আজ
মলিন বদন শতদল।
বুঝি সে দিনও এমনি জলের কাতর কলকল।

৫

তব সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার,
কত শ্মশানের অঙ্গার কত আঁখিধার।
শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি
তোমার আঁধার দিয়াছে যে গড়ি
কত সুষমার কত চিতা মরি
নিভেছে জ্বলেছে অনিবার।
তব সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার।

প্রত্যাবর্তন

কুলি যুবা ফিরছে ঘরে যুগের পরে আজ
কতই সুখ ও দুখের ছবি জাগছে হিয়া মাঝ।
পুঁটুলিটি দেখছে খুলে মায়ের তরে তার,
কলের কাপড় যাচ্ছে লয়ে, শীতের কাঁথা আর।
কাঁচের চুড়ি বেলোয়ারি প্রণয়িনীর তরে,
ক্ষুদ্র অতি আরশিখানি যত্নে কাগজ মুড়ে।

ক্ষণে ক্ষণে লয় সে তুলে শখের বাঁশি খান
গায় সে বসি মনের সাধে নূতন শেখা গান।
যেই বিচিত্র চিত্রে তাহার হৃদয়খানি আলা
কোথায় লাগে তাহার কাছে রোমের চিত্রশালা।

উপবাসী

উপবাসী আজ কন্যার সাথে দুখিনী
ঘরে নাই চাল অন্নও আজ জোটেনি।
কাটে না দিবস, কাতর প্রহর গনিয়া,
মহান্ত ভাত পাঠাইয়া দেন শুনিয়া।
অনাহারী হায় যেতেছে আহারে বসিতে
বহু দিন পরে তনয় আসিল দেশেতে।
কন্যা জননী অনাহার দুখ ভুলিয়া,
মহা আনন্দে হারানিধি নিল তুলিয়া।
তাহারে খাওয়ায়ে কত সুখী হল দুজনা
ভুলে গেল ক্ষুধা শত দুখ ক্লেশ বেদনা।
তারা তিন জনে বসে হাসি ভরা বদনে,
অশ্রু জোয়ার আসিল আমার নয়নে।

স্নেহময়ী

দারুণ পীড়ায় অতি বিশীর্ণ দেহ,
গৃহের বাহিরে তনয় বসিয়া আছে—
পার্শ্বে জননী হৃদয়ে অপার স্নেহ
বীজন করেন বসিয়া একাকী কাছে।
নিশা জাগরণে কালিমা-ক্লিষ্ট-তনু
শত আতঙ্কে ভরা প্রাণটুকু তাঁর,
তনয়ের লাগি দেহ প্রাণ অণু অণু
দান করিছেন যেন মাতা অনিবার।
ছিন্ন পক্ষ শাবকে বক্ষে ঢাকি
সারসী যেমন যতনে আগুলি রাখে,
তেমনি জননী সদা জাগ্রত আঁখি
সারা প্রাণ দিয়া ঘেরিয়া আছেন তাকে।

ডাকার মতো ডাক

মায়ে ঝিয়ে দুইজনে গোবর কুড়ায়ে ভ্রমে
বৃদ্ধ গোপ শায়িত শয্যায়,
অবসর নাহি তিল খাটে দোঁহে নিশিদিন
দরিদ্রের বিশ্রাম কোথায়।
গোবরের ঝুড়ি মাথে ফিরে যবে গ্রাম্য পথে
দেবালয়ে নিনাদে কাঁসর,
তিলেক নামায়ে ঝুড়ি বলে দোঁহে করজোড়ি
ডাকিতে দিলে না অবসর।
প্রণমি চিন্তিত মনে ফিরে যায় গৃহ পানে
যখন মন্দিরে বাজে শাঁখ।
ভেব না দুখিনী তুমি শুনিবেন অন্তর্যামী
প্রথমেই তোমাদের ডাক।

নৌকাপথে

মাঝি—ভিড়ায়ো না চলুক তরী নদীর মাঝে,
তরী—এ-ঘাটেতে বাঁধবনাকো আজকে সাঁজে।
ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে
জলটি যেথায় ছুঁয়েই আছে,
এখনো ওই যে ঘাটেতে পল্লীবালার কাঁকন বাজে
তরী হেথা বাঁধবনাকো আজকে সাঁজে।

২

ডুবছে রবি নীল গগনে যদিই আঁধার হয়ে এসে,
তবু নদীর মাঝে মাঝে তরী মোদের চলুক ভেসে।
এই গাঁয়েব হায় নামটি শুনে
প্রাণটি এমন করে কেনে,
ঘুম পাড়ানো কোন্ বেদনা জেগে ওঠে হৃদয়-মাঝে:
তরী হেথা বাঁধবনাকো আজকে সাঁজে।

৩

মৌন সাঁজের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁজের দীপটি ছোট, বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটি গৃহ হোথায় কিনা

ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটি যার আজও আমার হৃদয়-কোণে সদাই রাজে।
তরী হেথা বাঁধবনাকো আজকে সাঁজে।

৪

এই নদীরই এই ঘাটেতে এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসিটিরে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া;
সোহাগে জল উথ্‌লে উঠি
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি,
পথের মাঝে আমায় দেখে ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে।
তরী হেথা বাঁধবনাকো আজকে সাঁজে।

৫

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে, তটিনীর ওই শ্যামল-কূলে
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজো যে সেই চিতার 'পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে,
আজও মধুর মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে,
তরী হেথা বাঁধবনাকো আজকে সাঁজে।

প্রজাপতির মৃত্যু

প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে
করবী কুঞ্জে একটি করবী পাতে
মণি-সন্নিভ দুইটি ডিম্ব রাখি,
বারেক ফিরাল মৃত্যু আঁধার আঁকি।
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনি মরি,
সুত মঙ্গল কামনায় দিল ভরি।
স্নেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত শত নিধি,
নিঃশেষ করি ঢালি দিল যেন হৃদি।
সময় আসিল কাঁপিল করবী শাখা,
মৃত প্রজাপতি টলিয়া পড়িল পাখা।

স্নেহের জয়

১

ভীষণ সমরে বিক্রমে যুঝি রাজপুত গেল হারি,
প্রবেশিল আসি তুর্কি সৈন্য হিন্দুর বাড়ি বাড়ি।
জহর-ব্রতের পুণ্য অনল
দহিল অযুত স্বর্ণ-কমল,
ব্রহ্মার কোলে পশিল পুলকে সীতা-সতী সারি সারি।

২

বিজয়ী সৈন্য দেখিল মুক্ত বিশাল ভবনে ঢুকে,
একটি রমণী পিয়াইছে দুধ তনয়ে ধরিয়া বুকে।
প্রাণেশ বালার সমরের মাঝ
বীরের শয়নে ঘুমায়েছে আজ
জল নাই চোখে বেদনা দারুণ ফুটিয়া উঠিছে মুখে।

৩

অরাতি-শিশুরে সৈন্য জনেক জোরে নিতে চায় কেড়ে
ঝাপটি ধরিল বক্ষে জননী আপন তনয়টিরে।
এত কি কঠিন বাহু সুকোমল,
ছাড়াতে নাড়িল সৈন্য সবল
গর্বিত সেনা অসির আঘাত হানিল জননী শিরে।

৪

রুধিরের ধারা ঢাকিয়া ফেলিল বালকের সারা দেহ,
দূর হতে তাহা দেখিয়া সেনানী প্রবেশিলা আসি গেহ।
বলিলেন ডাকি, 'ওরে নরাধম
মানুষের হৃদি এত নির্মম,
পাস্‌নি পামর কখনো কি তুই নিজ জননীর স্নেহ?'

৫

সভয়ে সরিয়া দাঁড়াল সৈন্য নত করি আঁখিজোড়,
সেনাপতি বলে, 'ও বাহু ছাড়াতে সাধ্য কি আছে তোর?
স্নেহের অযুত কঠিন বাঁধন
অসিতে কি কাটা যায় রে কখন,
ভরতপুরের চেয়ে দুর্জয় ও যে জননীর ক্রোড়।

৬

জননী কণ্ঠে জড়াইল শিশু দুটি বাহু সুকোমল,
দেখি সেনানীর বিশাল নয়ন হয়ে এল ছলছল।
বলিলেন বীর, ক্ষম অপরাধ,
ছেড়ে চলিলাম তোমার প্রাসাদ
স্নেহের দুর্গ ভাঙিতে নাই মা আমাদের বুকে বল।'

অমর বিদায়

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
পোহাইলে সুখরাতি যে হবে অযোধ্যাপতি,
যোগীর বল্কল বাসে তারে কে সাজায়?
অভিষেক নির্বাসন বোধনেতে বিসর্জন
পূর্ণিমায় অমানিশি দেখে কে কোথায়?
শ্রীরাম যায় গো বনে সীতা লক্ষ্মণের সনে,
জগৎ সজল আঁখি থমকি দাঁড়ায়!
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

২

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
ক্রূর অক্রূর সাথে হরি গেল মথুরাতে,
শ্যামসোহাগিনী রাধা ধুলায় লুটায়।
গাহেনাকো শুক সারী, অধীর যমুনাবারি,
শ্যামলী ধবলী আজি তৃণ নাহি খায়,
কাঁদে গোপবালাগণে চাহি তমালের পানে,
ভাসানো কলসি কোথা ফিরিয়া না চায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকি সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

৩

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,

বুদ্ধদেব গৃহ ত্যজি লভিতে চলেন আজি
জনম মরণ জরা প্রশম উপায়,
মায়ার বাঁধন টুটি বিশ্বপানে যান ছুটি
অহিংস পরম ধর্ম বুঝাতে সবায়।
কাঁদে রাজা শুদ্ধোদন কাঁদে গোপা অনুক্ষণ
কাঁদিছে কপিলবাস্তু পাষাণ হিয়ায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়!

৪

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
আঁধিয়ারি নদীয়ারে কাঁদাইয়া শচীমারে
নিমাই সন্ন্যাস লন আজি কাটোয়ায়।
কেঁদে মরে ক্ষৌরকার হাত নাহি উঠে তার
কেমনে সাজাবে দণ্ডী নবীন যুবায়,
ভকতের আঁখিজলে কঠিন পাষাণ গলে
ডুবু ডুবু শান্তিপুর নদে ভেসে যায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

৫

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়
'কোরেসের' অত্যাচারে ওই চলি যান দূরে
ইরম্মদ মহম্মদ ত্রিদিব প্রভায়,
ওরে সে যে সর্বত্যাগী ডরে না প্রাণের লাগি,
পবিত্র ইসলাম ধর্ম জানাবে সবায়।
দিতে এসেছিল ধরা তখন বুঝেনি ধরা,
এখন কাঁদিছে বসি পূত মদিনায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

৬

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
ওই ক্রুশে আরোপিয়া মারিছে যন্ত্রণা দিয়া
চিরক্ষমাশীল যিশু নর দেবতায়,

কন্টকমুকুট শিরে দিয়া কি করিবি ওরে
ত্রিদিব কিরীট যার শিরে শোভা পায়,
যিশু হায় ক্রুশে থেকে জগৎ পিতারে ডেকে
বলেন,—ক্ষমিয়ো পিতা অবোধ সবায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

গুরুদণ্ড

পড়িতে পারে তবু, তবু পড়ে না একবার,
দূরেতে বই ফেলে পালায় বারবার,
নিষেধ মানে না সে; দুষ্টু অতিশয়
গুরু কি গুরুজন করে না কারে ভয়।
শুনিয়া রোষ ভরে আনানু বেতখান
ধরিনু হাতদুটি মুখটি হল ম্লান।
কাজল জলে ভেজা চাহিল আঁখি তুলি
সকল দোষ তার নিমেষে গেনু ভুলি।
আসামী শিশুটিরে লইয়া কোলে তুলে,
বলিনু ভালো করে পড়িস্ বোকা ছেলে।

বীথি
১৯১৫

অন্বেষণ

নাইকো আলাপ তোমার সাথে তবু দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি,
তুমি যে শ্যাম শশধর হে—আমার মানস গগনচারী।
বুভুক্ষু ওই আহার পেয়ে আছে দাতার পানেই চেয়ে,
ওই দেখ ওই তুমি এলে ঝরাবে তার নয়ন বারি,
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।
বিদ্রোহী ওই রাজার কাছে কাতরে প্রাণ ভিক্ষা যাচে,
তুমিই ক্ষমার আজ্ঞা দিলে বারেক এসে বক্ষে তারি,
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
ওই যে সাধু নদীর তীরে বসে আছেন আদুল গায়ে,
তুচ্ছ করি হিমের পীড়ন অতি দারুণ পৌষের বায়ে।
তাহার বিমল পুলক মাঝে জাগছ যে হে সকাল সাঁজে,
উজল আঁখির দীপ্তিতে তার পড়ছ ধরা দুঃখ হারী,
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।
জননীর বেশ নিজেই ধরি আছ তনয় বক্ষে করি,
দাতার বেশে দিচ্ছ তুমি অন্য বেশে নিচ্ছ কাড়ি,
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
ওই দেখ ওই রাজার সাজে করছ দমন দুষ্ট জনে,
ওই দেখ ওই জ্ঞানীর বেশে মগ্ন কিসের অন্বেষণে।
কতই ভাবে কতই বেশে দিচ্ছ দেখা নিত্য এসে,
চঞ্চল, এ অঞ্চলে হে বারেক তোমায় ধরতে নারি—
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।
ছড়ানো রূপ পীযূষ কণা পিয়ে যে মোর বুক ভরে না,
বৃন্দাবন চন্দ্র রূপে দাও হে দেখা বংশীধারী—
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।

তীর্থযাত্রা

এবার পূজার বন্ধে করিলাম মনে
যাব বন্ধুর সাথে তীর্থ পর্যটনে।
শুধু সংসারের চিন্তা, শহরের গোল
করিয়াছে ঝালাপালা, লভি শান্তি কোল
জুড়াই দু-দশদিন। শুভদিন দেখে
বাহিরিয়া বাসা হতে কাশী অভিমুখে
নামিলাম গুস্করায়, বন্ধু গৃহ হয়ে
যেতে হবে। যাব সাথে তাহারে যে লয়ে।
বেলা অপরাহ্নে এক ক্ষুদ্র গ্রামে আসি
জানিলাম সেই গ্রাম পথিকে জিজ্ঞাসি।
করিতে বন্ধুর নাম জনেক আসিয়া
সযত্নে সে গৃহ মোরে দিল দেখাইয়া।
দেখিলাম বন্ধু মোর ঘাস লয়ে হাতে
বাছুরগুলিরে নিজে দিতেছেন খেতে।
গৃহে ঢুকিবার পথে যে দিকেতে চাই
কেবল উঠান জোড়া ধানের মরাই।
প্রকাণ্ড খড়ের 'পল' পুষ্ট গাভী দল
রয়েছে গোয়ালে বাঁধা বলদ সকল।
সারি দিয়া বাঁধা আছে। দূরে জন দুই
মজুর আপন মনে পাকায় বাবুই।
কাছেই পুকুর এক চারি দিকে গাছ
চলেছে বালক দল ধরিবারে মাছ।
উঠানে নাহিক গাছ এক পাশে খালি
করবী দু-ঝাড় আর একটি শেফালি।
দূরেতে নিকানো তল তুলসীর গাছে
গৃহস্থের যত্নটুকু সব পড়িয়াছে।
হেরিয়া আমারে বন্ধু জোরে হাত টানি
লয়ে গিয়ে বসাইল মা'র কাছে আনি।
তখন বন্ধুর মাতা জপাহ্নিক সারি
উঠেছেন, দেখি মোরে, আসি তাড়াতাড়ি,
বলিলেন, এস বাবা ভালো আছ বেশ,
পথেতে বাছার কত হইয়াছে ক্লেশ।
করাইয়া জলসেবা অর্ধ ঘণ্টা পর
ডাকিলেন স্নেহভরে জননী তৎপর।

কি রন্ধন! সে যেন গো দেবের প্রসাদ,
খেয়েছি সে কতদিন আজো খেতে সাধ।
তারপর শুধালেন দাসীকে ডাকিয়া
ও পাড়ার 'বিধু' 'শ্যামা' গেছে তো খাইয়া?
ভাত লয়ে গেছে হরি? অম্বিকের মেয়ে,
পড়েছিল এতদিন আহা জ্বর হয়ে,
আজিকে পাইবে পথ্য, সরু চালগুলি
দিয়ে তো এসেছ তারে? রেখেছিনু তুলি।
রাগিয়া কহিল দাসী, খেয়েছে সবাই,
ইচ্ছা হয় খাও তুমি, এ এক বালাই।
শুনিলাম অনাহারী এখনো জননী,
গ্রামের না খাওয়া হলে খান না আপনি।
বলেন, শুধালে, বাছা লক্ষ্মী যদি রয়
সবারে খাওয়ায়ে তবে নিজে খেতে হয়।
বাহিরে আসিয়া বসি ভাবিলাম মনে
হেন পুণ্য-কাশী কোথা মিলিবে ভুবনে।
সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা দেখিলাম যবে
বৃথা বারাণসী আর কেন যাব তবে।
ভক্তি ভরে ক্ষুদ্র গ্রামে তিন দিন ধরি,
জীবন্ত দেবীর সেই মূর্তি পূজা করি,
তীর্থ ভ্রমণের কথা বন্ধুরে না বলি
লভি তীর্থ ফল, গৃহে আসিলাম চলি।

পল্লী কবি

অজয় পারে ওই যে ভাঙা দেয়াল আছে পড়ি,
শিউলি এবং শ্যাম লতাতে করছে জড়াজড়ি।
বছর বিশেক আগে
মনের অনুরাগে
থাকত হোতায় পল্লী কবি অনেক দিবস ধরি।

২

ভোর হলে সে ডাঙার মাঠে আগেই যেত ছুটি
মুখটি তাহার দেখত রবি সবার আগে উঠি।

কোকিল নিশি ভোরে
ডাকত তাহার দোরে
না উঠতে সে, কুসুমগুলি উঠত আগেই ফুটি।

৩

সাঁজের বেলা থাকত পারের ঘাটটি পানে চেয়ে
ফিরত বাড়ি কৃষক তারি তৈয়ারি গান গেয়ে।
হাসত শুনে কবি,
ডুবত নভে রবি,
মাঝিরা সব যেত তাদের বোঝাই নৌকা বেয়ে।

৪

গ্রামখানিকে ঘিরত যখন রাঙা 'অজয়' বানে
উঠত যেন কি এক তুফান কবির কোমল প্রাণে।
শশক শিশু ধরি
রাখত বুকে করি
বাঁচাত সব পাখির ছানায় স্নেহের ছায়াদানে।

৫

রাখাল রাজার ভক্ত ছিল রাখালগণের প্রিয়,
অতিথিদের সৎকারেতে পুণ্য তাহার গৃহ।
সর্ব জীবে দয়া
অতুল স্নেহ মায়া
হরিনামে চোখের বারি পরম রমণীয়।

৬

গেছে কবি নামটি তাহার গাঁয়ের বুকে আঁকা
তরুলতার শ্যামল গায়ে মমতা তার মাখা
আজও তাহার গানে,
তারেই ফিরে আনে,
আজও তাহার বিহনে গ্রাম ঠেকছে ফাঁকা ফাঁকা।

অনুরোধ

রূপের লাগি যদি আমারে ভালোবাসো
চরণে ধরি ভালোবেসো না
রবিরে ভালোবাসো রূপের আকর সে
আমারে দিয়ো না সখা যাতনা।
ধনের লাগি যদি আমারে ভালোবাসো
মিনতি করি ভালোবেসো না
জলধি ভালোবাসো রতন আকর সে
মিটিবে সখা তব কামনা।
আমার লাগি যদি আমারে ভালোবাসো
জনম জনম সখা ত্যজো না
হৃদয় ফুলসম দিব হে তব পায়
আপনি বিকাইব আপনা।
রূপ তো দু-দিনের সুখ সে স্বপনের
দু-দিনে নিভে যাবে রবে না,
প্রেম যে চিরদিন রহিবে হৃদে লীন
কভু বিপথ পানে যাবে না।

বৈষ্ণব পদাবলী

ভক্তির ভাণ্ডারে ওগো তোমরা সুন্দর
অক্ষয় উজ্জ্বল মণি, অমূল্য অতুল,
প্রেমের নন্দন বনে আছ নিরন্তর
চিরস্ফুট মধুময় পারিজাত ফুল।
প্রীতির পীযূষ সবে তোমরা নির্মল,
চির নভ সুরভিত নীল ইন্দিবর
হরি পাদপদ্ম মাঝে চির অচঞ্চল
তোমরা সুতৃপ্ত মুগ্ধ প্রমত্ত ভ্রমর।
রাধার চরণ স্পর্শে উঠেছ কি ফুটি
ভক্তি বৃন্দাবনে শত অশোক মঞ্জরি
কিংবা মুকুতার মালা অভিমানে টুটি
ছড়াল কবিতা কুঞ্জে ব্রজের সুন্দরী?
না গো না বৈষ্ণব ভক্ত রেখে গেছে হেতা,
ছোঁয়ায়ে হরির পদে তুলসীর পাতা।

প্রতীক্ষায়

এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান
নিরাশে কেটে গেল দীরঘ দিনমান।
অদূরে নীলাকাশে
তপন নিভে আসে
দিনের আলো ধীরে হল যে অবসান
এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান।

২

গহন কালো মেঘ জমিছে নভ গায়
ঝটিকা হু হু করে মরম বেদনায়।
ধূসর তরু শিরে
আঁধার নামে ধীরে
পথিক আর কেহ পথে না দেখা যায়
গহন কালো মেঘ জমিছে নভ গায়।

৩

ডেকেছে বান আজি ফুলিছে নদী জল
আঘাতি দুটি তীরে করিছে কল কল।
ভাঙা এ তরী মোর
ভাসাতে করে জোর
তরণী ঘায়ে ঘায়ে কাঁপিছে অবিরল,
ডেকেছে বান আজি ফুলিছে নদী জল।

৪

দিতেছি খেয়া আমি বহু দিবস ধরি,
যাহার পথ চেয়ে হেথায় আছি পড়ি,
মোর সে প্রাণ প্রিয়
ভুলে কি গেল গৃহ,
সে চির পরিচিত এলো না আজো মরি,
দিতেছি খেয়া আমি বহু দিবস ধরি।

৫

পাব এ বুক মাঝে তাহারি পদ জোড়
কাষ্ঠ তরীখানি হবে কনক মোর।
রয়েছি হেথা হায়
এখনো সে আশায়,
তটিনী সাথে মোর মিশিছে আঁখিলোর
পাব এ বুক মাঝে তাহারি পদ জোড়।

পুণ্যশ্লোক

লোকটা তিনি সত্য বটে ছিলেন পুণ্যশ্লোক
নামটি শুধু প্রভাত কালে করতনাকো লোক।
করতে কিছু বাকি বড় ছিলনাকো তাঁর
করেন নাইকো জীবনেতে পরের উপকার।
সেই খেদটা মিটিয়ে গেলেন এত দিনের পরে
জীবনে যা করেননি তা করে দিলেন মরে।

প্রগল্‌ভ

মদমত্ত চামচিকা এক গরুড় পাখির ঘাড়ে
উড়ে যেতে পড়ল গিয়ে সাঁজের অন্ধকারে।
প্রাতে গিয়ে বললে একটা কাণ্ড শোন খুড়া
আমার পাখায় লেগে গরুড় কালকে হত গুঁড়া।
ভাগ্যে একটু সামলে ছিল নৈলে হত সাফ,
কৃষ্ণ তারে রাখতে জেনো পারতনাকো বাপ।
পক্ষীরা সব এ-সব কথা তুললে গরুড় কানে
চামচিকেটার অহঙ্কার যে যায় না সহা প্রাণে।
হেসে গরুড় বলেন তারে দাও গো বলিহারী
জানুক সবাই চামচিকেরি কাছেই আমি হরি।

তার্কিক

রয়েছে 'ভাটপাড়া' ছাড়িয়া ভাট,
নাহি সে বাবু আছে 'বাবুর ঘাট',

নামটা 'শুকচর', নাহিকো শুক,
দেখিয়া বাড়িয়াছে মোদেরও বুক।
চলিয়া গেছে যদি দেশেতে এতখানি,
হিঁদু না রবে কেন ছাড়িয়া হিঁদুয়ানি।

আদর্শ শিক্ষক

পড়োর পিতা আসি করিয়ে সবিনয়
বলিছে ছেলে মোর বোকা কি অতিশয়?
যা কিছু শিখেছিল বাড়িতে মহাশয়
এখানে ভুলে গেল এটাত ভালো নয়?
রাগিয়া কহে গুরু সরাতে হবে মাটি
তবে তো পাকা 'ভিত' বসানো যাবে খাঁটি।
আইরি নাড়াগুলা তুলে না দিলে হেন
জ্ঞানের সারো কচু বসানো যাবে কেন?
এসব সোজা কথা বোঝ না জ্ঞানহীন
জোলাপ না দিলে কি ধরে হে কুইনিন।

অপূর্ব ওভরসিয়র

মণ্ডলদের দালান গেল বিশ বছরে ফেটে
ওভরসিয়র দেখে রেগে গেলেন বড়ই চটে।
বলেন আমি দালান করে দেখিয়ে দিতে চাই
মাল মসলার জ্ঞানটা লোকের একেবারেই নাই।
বিজ্ঞানেতে নেইকো দখল পণ্ডিত যে সবে
দালানগুলো স্থায়ী বল কেমন করে হবে।
হল দালান দুই বছরে ধরল মহাফাট
গ্রামের লোকে হাসির রোলে লাগিয়ে দিলে হাট।
বসেছিলেন যারা শুধু ওভরসিয়র কাছে
বলেন যত কারিগরি ফাটের মাঝেই আছে।

নীচ

সাত সমুদ্র তেরো নদী এলেন যেথা দোড়ে
এলনাকো সেথায় রোষে খড়ে এবং ফড়ে।
এলেন যেথা হরি হরে আনন্দেতে মাতি
এলনাকো সেথায় ক-জন বকাসুরের জ্ঞাতি।
সকল পাখি এল ছুটে তপোবনে সাধুর
রোষ করিয়া এলনাকো কালপেঁচা ও বাদুড়।
দুঃখ তাতে এতই বা কি তোমরা বল দেখি
মহাপ্রসাদ না খান যদি মড়াখেকো খেঁকি।

দারোগা

ভূতপূর্ব দারোগা এক দাগীরে কন ডাকি
দেশে তোদের চোরের সংখ্যা তেমনি আছে নাকি?
দাগী বলে একেবারে মিথ্যা নয় যা রটে
আপনি আসায় চোরের সংখ্যা কমতি কিছু বটে।
আমরা তো তাই দিবানিশি করছি তোলাপাড়া
হুজুর বিনে হয়ে আছি অভিভাবক হারা।

ইচ্ছামৃত্যু

দুটি বছর জ্বর ও শোথে পেয়ে অশেষ কষ্ট
ভীমরতিতে দু-মাস আগে স্মৃতিই হল নষ্ট।
মুখ নাইকো হরেকৃষ্ণ নারায়ণ কি গঙ্গা
দু-দিন আগে হারাইল একেবারে সংজ্ঞা।
রাখতে শেষে ডাক্তার এবং আত্মীয়দের মানটা
অনেক কষ্টে অনিচ্ছাতে ত্যাগ করিলেন প্রাণটা।
বলে লোকে অবাক হয়ে, দেখুক এবার বিশ্ব
মরণ বলে মরণ এ যে মলেন যেন ভীষ্ম।
একেবারে ইচ্ছামৃত্যু, মরণ নয় এ মোক্ষ,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটে নাইকো এইটুকু যা দুঃখ।

ভীষণ চোর

সুধায় পথিকে এক ভদ্রলোক ডাকি
এই হুঁকা কোথা পেলে মোরে কহ দেখি।
এ যে মোর হুঁকা আছে সহস্র প্রমাণ
জল পুরে টানিলেই বেজে উঠে টান।
বলিহারি দাগাদারি পাছে হয় গোল
সেই ভয়ে বদলেছ নলচে ও খোল।

পক্ক ইচড়ের গান

আমার পাকার যখন কথা ছিল তখন পাকিনি,
আমি আগে ভাগে পেকে গেছি খেয়াল রাখিনি।
আষাঢ়েতে পাকলো যে ধান,
'সমের' আগেই থামল রে গান
না দেখিয়াই মজলো রে মন এমন দেখিনি;
আমার পাকার যখন কথা ছিল তখন পাকিনি।

দিন দুপুরে উঠল রে চাঁদ আমার গগনে
'বলো হরি' করলে আমায় বিয়ের লগনে,
এ ব্যথা কি ফুরায় কয়ে,
ললিত গেল বেহাগ হয়ে,
কৃষ্ণে আমার করলে কালী এ কোন ডাকিনী :
আমার পাকার যখন কথা ছিল তখন পাকিনি।

অস্ফুট

ফুটে গন্ধ বিলিয়ে যারা পড়ল ঝরে পড়ল গো,
তাদের লাগি আকুল সারা কুঞ্জ যে,
গন্ধ বুকে বন্ধ করে, না ফুটে যে ঝরল গো
তাহার তরে কই না ভ্রমর গুঞ্জরে।

২

পলায় যে জন ধরায় করে সুধার ধারা বৃষ্টি গো,
হয় যে সে সুর শতেক প্রাণে ঝঙ্কৃত।
না গেয়ে যে পড়ল লুটি, বিফল কি তার সৃষ্টি গো
কোথায় ব্যথা রইল তাহার অঙ্কিত।

৩

যে বীজটি হায় গড়ল তরু, সফল তাহার জন্ম গো,
হারিয়ে গেল বিরাট মাঝে ক্ষুদ্র সে,
বুঝবে কে তার গুপ্ত ব্যথা, বুঝবে কে তার মর্ম গো,
ক্ষুদ্র করে রাখলে যে তার রুদ্রকে?

৪

মহারাজের পুত্র যে সে থাকল হয়ে ভৃত্য গো,
পর্ণবাসে যাপল জনম দুঃখেতে,
গাণ্ডিবী হায় বৃহন্নলা মগ্ন লয়ে নৃত্য গো,
তূণীর তোলা রইল শমীবৃক্ষেতে।

৫

শ্রীবৎসরাজ রইল মিশে কাঠুরিয়ার সঙ্গে গো,
নল রাজের কাটল জীবন রন্ধনে,
কৌস্তুভে হায় চিনল না কেউ, উঠল না শ্রী অঙ্গেতে,
চন্দন কাঠ লাগল ধরার ইন্ধনে।

৬

পুণ্যমুকুল পারিজাতের শুকিয়ে গেল বৃন্ত গো,
হেম মরালের কণ্ঠে ছিল পত্রটি,
অমৃতের সে বার্তাবহ নারলে তারে চিনতে গো,
পেলে না তার পড়তে লিপির ছত্রটি।

৭

সে যে কালের জতুগৃহে দারুণ তাপটা সইল গো,
করল না তো দিনেক তরে রাজ্যভোগ,
বিরাট গৃহে ক্ষুদ্র হয়ে রইল সে যে রইল গো,
জীবনে আর আসল না তার ইন্দ্রযোগ।

অপূর্ণ

মাগিতেছে পূর্ণাহুতি দীপ্ত হোমানল,
কোথায় ঋত্বিক? ধরা করিতেছে খেদ,
কোন্ ইন্দ্র হরে নিল তুরগ চঞ্চল,
অপূর্ণ রহিয়া গেল মহা-অশ্বমেধ।
কোন্ অবিশ্বাসী দিল মুক্ত করি দ্বার—
অর্ধগড়া মূর্তি, হল বিশ্বকর্মা চুপ,
দেবতা গঠন সাঙ্গ হলনাকো আর,
অসমাপ্ত রয়ে গেল অফুরন্ত রূপ।
অর্ধলেখা কাব্য রাখি গেল চলে কবি
প্রেম গেল স্মৃতি রাখি হৃদি কোকনদে,
গেল শিল্পী রাখি রম্য অসমাপ্ত ছবি
পূর্ণতা কাদিয়া মরে অপূর্ণের পদে।
শুক্লা চতুর্থীর চাঁদে বৃত্ত রেখা ক্ষীণ
আলোকের আবছায়ে হয়ে থাকে লীন।

বিষাদ ছবি

তোমারে দেখেছি ওগো আকুলিত লোচনে
অনুখন শোচনে ও আঁখিজল মোচনে,
রাঙা রাঙা ভাঙা মেঘে সবিতার শ্মশানে
সুষমার চিতা পাশে বিজয়ার ভাসানে।

২

ফলশেষ তরুতলে ফুলশেষ লতাতে
আঁখিজলে বাধা পাওয়া আধা আধা কথাতে।
বুকে চাপা দুখে কাঁপা দুখিনীর অধরে,
পোকা ধরা নুয়ে পড়া ফুলকলি অধরে।

৩

শিশুহারা হরিণীর ছলছল আঁখিতে,
ভোল নাই ভাবাকুল আঁখি তব রাখিতে।
বিহগেরে খরশরে বেঁধে যেই নিষাদে
বুকে তারে ধরি কাঁদ বিষাদিনী বিষাদে।

৪

রও আঁকা ধুলাঢাকা বিধবার মুকুরে,
ঘুণধরা কাঁচাবাঁশ পদহারা নূপুরে।
এস কেঁদে কেঁদে ফোলা আঁখিকোলে মসিতে,
মিশে রও নিশিশেষে ঢুলেপড়া শশীতে।

৫

বল কোন উচাটন ব্রতে ছিলে লগনা,
ছিলে কোন ধূমাবতী ধ্যানে তুমি মগনা?
হলে তুমি বল কার বঞ্চিত সোহাগে,
মরমের বীণা তার বাঁধিয়াছ বেহাগে?

রামপ্রসাদ

তুমি আসিবার আগে ফুটিত না হেথা
আমাদের গৃহ জবা বারোমেসে ফুল,
তুমি আসিবার আগে রাঙা রঙে তার
সে রাঙা চরণ বলে হতনাকো ভুল।

২

তুমি আসিবার আগে রাজ-রাজেশ্বরী
শুভঙ্করী ভয়ঙ্করী ছিল মা মোদের,
মায়েরে মা করে নিলে তুমিই প্রথম
চিনাইলে অন্নপূর্ণা ধাত্রী জগতের।

৩

তুমি যে দামাল ছেলে আদুরে গোপাল,
কেড়ে নিলে মুণ্ড মালা, অসি খরধার,
মায়ের আটাশে ছেলে, অতুল সোহাগ,
দশ হস্তে ঘুরে ফিরে ঝিনুক খোঁকার।

৪

ভক্তি আর শক্তি এক, নহে ভিন্ন ভেদ,
তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার,
গান আর প্রাণ তুমি করে দিলে এক,
ভক্তিকে করিয়া দিলে পূজা উপচার।

৫

হে ভক্ত, পূজার লাগি গড়ে দিলে তুমি
ভক্তি ভরে যেই শিব গঙ্গা মৃত্তিকার,
জাগ্রত দেবতা হয়ে মহামহিমায়
হল তা অনাদি লিঙ্গ পূজিত সবার।

পুরনো প্রেমপত্র

হঠাৎ যেন উঠল বেজে হুলুধ্বনি বাজনা শাঁক
শিষ দিয়ে কে আনলে ডেকে হারানো মোর পায়রা ঝাঁক।
শুকনো ডালে উঠল যেন কুসুম কোরক মুঞ্জরি
পাঁপড়ি ঝরা বৃন্তে এল মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরি।
দোলের আবির ছড়িয়ে দিলে ত্যক্ত তিমির কুঞ্জে কে
জ্বাললে ভাঙা নাট্যশালায় সুপ্ত দীপ পুঞ্জ রে।
যৌবনেরি লজ্জা হাসি চুম্বনেরি দ্রাক্ষারস
কেমন করে রাখলে ধরে শুষ্ক কালির কৃষ্ণ কস্।
কাল যাহারে রাখতে নারে কালী তারে রাখলে গো
যৌবনেরি যৌতুকেরে যতন করে আগলে গো।
হারা তরীর পণ্যরাশি বাঁশির হারা সংগীতে
ফিরায়ে কে আনলে আজি অমনি আঁখির ইঙ্গিতে।
কোন্ অলকার যক্ষবালা দক্ষ তুমি মোর প্রিয়ে
রাখ্‌লে প্রেমের মণি মানিক এমন করে যক্ দিয়ে।

খোঁকা

একটি বছর গিয়েছিল শুধু বিদেশে,
দুষ্টামি আর করেনাকো কেন সে এসে।
জ্ঞানটি হল ছ-বছরে এত কি বেশি
ছেড়ে দিলে এমন করে ছেলেমানুষি?
অপ্রতিভ সে সদাই যেন সকল কথাতে
চিন্তা এল কোথায় থেকে তাহার মাথাতে।
'খোট করা' তুই ভুলে গেলি কার কথা শুনি?
গাণ্ডীবে তোর ফেলে দিলি ওরে ফাল্গুনি।
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল মোরে বল্ দেখি
ফেললি রঙিন পাখা ছিঁড়ে ওরে মোর শিখী?
দুষ্টামি তোর ছাড়িসনাকো শোন্ তোরে বলি
মৃণালে তোর থাকুক কাঁটা রে কমল কলি।
তৃপ্ত ধরা দীপ্ত মধুর জ্যোৎস্না পেলে,
কাজ কি কালো দাগটি চাঁদের মুছিয়া ফেলে।

চৈত্র বৈশাখী

বসল নাতি ঠাকুরদাদার কোলটি সারা জুড়ি,
সংসারেরি পক্ক ফল ও নূতন ধরা কুঁড়ি।
ওপারেরি যাত্রী এবং নূতন আগন্তুকে
পারের ঘাটে মধুর আলাপ করছে মনোসুখে।
প্রভাতকালে পশ্চিমেতে অস্তাচলে বসি,
সম্ভাষিছে অরুণেরে শুভ্র রাকাশশী।
লক্ষ্মীজোলে পাকার পাশে নূতন রোয়া ভুঁই
ধুতুরারি পত্র ফাঁকে অর্ধ ফোটা যুঁই।
বাঁধল অতীত ভবিষ্যতে দিয়ে সোনার রাখী
ফুলল ভোর ও শ্যামল সাঁজে মধুর মাখামাখি।
কালো মেঘের মাঝে উজল কনক কিরণ রেখা,
ভরত বাক্য শেষে নূতন প্রস্তাবনা লেখা।
মাথুর এসে মিশল হঠাৎ পূর্বরাগের সনে
মধুরতর নিবিড় মিলন—বোধন বিসর্জনে।

হৃদয় ভরা কোলাকুলি সাদা কালোর সাথে
যুক্ত ত্রিবেণীতে মিলন গঙ্গা যমুনাতে।
হংস উঠে শিউরে শিখী পুচ্ছ তুলি নাচে
কার্তিকেয় দাঁড়ায় যবে চতুর্মুখের কাছে।

প্রথম চিঠি

এইখানি তার প্রথম চিঠি হাতের প্রথম লেখা
আঁখরগুলি হিজিবিজি সারগুলি সব বাঁকা,
অফুট ফুলের সৌরভ এ গৌরবে তার ভরা
খেলার ঘর এ তাজমহলের শিল্পী শিশুর গড়া।
বালক ফিডিয়াসের পুতুল তৈরি নিজের হাতে,
শিশু কালিদাসের কাব্য লেখা খাতার পাতে।
র‍্যাফেলের এ হাতের ছবি শৈশবেতে আঁকা,
খনির প্রথম মণি এ যে কাদা ধুলায় মাথা!
তানসেনের এ সা রি গা মা লীলার অঙ্করাখা,
ডিমস্থিনির তোতলামি এ মধুরতায় মাখা।
অর্জুনের এ খেলার সায়ক, প্রভাত রবির ছটা
আষাঢ়েরি প্রথমে এ নবীন মেঘের ঘটা।
বসন্তের এ প্রথম কলি, চাঁদের প্রথম আলো,
এইখানি তার প্রথম চিঠি বাসি যারে ভালো,
কোকিলার এ প্রথম সাড়া শিখীর প্রথম কেকা
এইখানি তার প্রথম চিঠি হাতের প্রথম লেখা।

দূরের যাত্রী

নাইকো দেরি ছাড়বে তরী আঁখির পলকে
শেষ মালা মোর জড়িয়ে দিলাম তোমার অলকে।
যে ফুল ছিল আমার প্রাণে
দুল হবে সে তোমার কানে
অশ্রু আমার মুক্তা হবে তোমার নোলকে।

২

বসন্ত ছয় কাটল সখি এই সে তীরেতে
বক্ষে মালার ঠাঁই হত না ক্ষুদ্র নীড়েতে।
তীরের স্নেহ তরুর ছায়া
সাথীর প্রীতি নীড়ের মায়া,
ছেড়ে যাবে এমন করে জান্‌ত বল কে?

৩

সইরে তব স্বর্ণ স্মৃতি বক্ষ জুড়ানো
রইল মণি মঞ্জুষাতে যত্নে কুড়ানো।
অনুরাগের অলক্তকে
চরণ তব দিলাম এঁকে
বিদায় ব্যথা রইল গাঁথা হৃদয় ফলকে।

দ্বারাবতী*

(নাটক) প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য
(কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধশেষে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদকক্ষে অর্জুন)

অর্জুন। মহাষ্টমী পূজা শেষ। সাঙ্গ বলিদান।
রক্ত মাখা খড়্গা লয়ে নৃত্য সমাপন।
ওই ধীরে ধীরে, এল শান্তির বিজয়া,
ধুয়ে দিতে রক্তধারা নয়নের নীরে।
ভল্লযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, আজি হবে হারা
প্রণয়ের আলিঙ্গনে। কোথা তারা? কোথা?—
কারে দিব আলিঙ্গন? পুত্র প্রাণাধিক,
ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়েরা আজ তারা কই?
বিয়োগান্তে নিদারুণ মহাকাব্য লিখি
বসি একা কাঁদে কবি! ফিরেছে ঋত্বিক
নরমেধ-যজ্ঞ শেষে, হোমের বহ্নিতে
দারুণ পিঙ্গল দেহ।
অনৃত মুখর
ওগো ইতিহাস, তুমি করিবে চিত্রিত
কত না বিচিত্র বর্ণে এ জীবন মম!
কলঙ্ক কালিমা লেপি হয় তো করিবে
বিদ্বেষের ব্যঙ্গছবি। হয়তো গড়িবে
হাস্য-উপহাস মাঝে, কুশ-পুত্তলিকা
মোর দহনের আগে দহিতে অনলে।
বুঝি জগতের কাছে, নর-হন্তা বলি
দিবে ঘৃণ্য পরিচয়। হয়তো হইবে
এ গাণ্ডীব, এই বর্ম, কলঙ্ক নিশান
অরাতির যাদুঘরে। হয়তো বা পরে,
দূর দূর ভবিষ্যতে, অজ্ঞাত কারণে—

নির্বাচিত অংশ

ফিরাবে করুণা আঁখি। নির্লজ্জ বেদনে
গাবে মহত্ত্বের গীত। হে চির চঞ্চল!
কলঙ্কিত চিতা 'পর, মর্মর দেউল
তুলে দিবে দেশবাসী। করিবেক পূজা
ধর্ম-সংস্থাপক, কিংবা মহাবীর বলি।
একমাত্র তুমি শুধু জান অন্তর্যামী
নহি রাজ্য-শক্তি লোভী। করেছি সংগ্রাম
নিমিত্তের ভাগী হয়ে।

(দূরে শিবিরে গীত)

রণ-প্রত্যাগত ওই সৈনিকের গীতে
উঠে প্রাণ উদ্বেলিয়া।

(গীত)

তারাই শুধু আসবে না রে, তারাই শুধু আসবে না।
সেনানীর ওই মাথার খুলি,
হবে কোমল ধরায় ধূলি,
সমর-ব্যূহের ব্যাপার জটিল
মোটেই সেথা পশবে না।
ওই পরিখা বুজবে জেনো,
জাগবে সেথা জাগবে তৃণ,
লক্ষ বুকের শোণিত টেনে
কিংশুকও কি হাসবে না।
তারাই শুধু আসবে না রে, তারাই শুধু আসবে না।
লুট্‌ল যেথা ভীষ্ম দেহ
পারবেনাকো বলতে কেহ—
কাল যে এসে কৃষক বেশে
লাঙল দিয়ে চসবে না।
ওই যেখানে সপ্তরথী
ফেললে কোরক পদ্ম মথি,
বললে কে ওই দারুণ ভূমি
হাস্য-আলোয় ভাসবে না।
তারাই শুধু আসবে না রে, তারাই শুধু আসবে না।
শোণিত যেথায় শোণিত লাগি
করলে কামান দাগাদাগি
হোথায় কি কেউ কুটির রচি
প্রিয়ায় ভালোবাসবে না।

মন্ত্রণাগার ওই সে যেথা
রইত রণের চিত্র পাতা
অসম্ভ্রমে চলবে পথিক
শাস্ত্রী তারে শাসবে না।
তারাই শুধু আসবে নারে, তারাই শুধু আসবে না।

সত্য তারা আর হেথা আসবে না ফিরি।
মোর কর্ণে বেজে উঠে যেই হ্রেষা ধ্বনি,
রথের ঘর্ঘর শব্দ, হস্তীর বৃংহণ,
শঙ্খের অম্বুদনাদ কোদণ্ড টঙ্কার;
চক্ষে মোর ভেসে উঠে সজ্জিত সুন্দর
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, বর্মাবৃত হিয়া।
আজ তারা কোথা?
(বাতায়ন পথে দৃষ্টি করিয়া)
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ বেলা ম্লান হয়ে এল
কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে রক্ত সন্ধ্যা আসি
করে দিল নভস্থল শোণিতে রঞ্জিত।
এমনই সে আসে যাবে যুগ যুগ ধরি।
সদ্য শোণিতের 'পরে, জমিবে মৃত্তিকা,
তার পর হবে তৃণ, পরে বৃক্ষ-রাজি;
সহস্র বৎসর পরে, সেই রণভূমে
দাঁড়ায় পথিক যদি, হয়তো এমনই
হেরিবে এ রক্ত সন্ধ্যা। ভাবিবে সে মনে—
যুগান্তের রক্ত যেন ঘনীভূত হয়ে,
লাগিয়াছে সন্ধ্যাকাশে, হয়তো দু-ফোটা
নেত্র নীর ফেলে যাবে। হয়তো স্মরিবে
এই গাণ্ডিবীর কথা। প্রশংসা-নিন্দার
কত কথা কয়ে যাবে। স্মরিবে কি কভু
অর্জুনের তীব্র ব্যথা, এই অশ্রু ধার।
(শিবিরে গীত)
নয়ন ধারা পড়ছে ঝরে
তোমাদের ওই অস্থিতে।
লাগবে শিকড় দ্রাক্ষালতার
থাকবে বিপুল স্বস্তিতে।
বুকের শোণিত বিন্দু বিমল,
ফুটবে হয়ে রক্ত কমল

অমৃত হ্রদ করবে আমোদ
টুটবে না কাল হস্তীতে।
গেলে সুধার কলস পিয়ে
জীবন দিয়ে জীবন নিয়ে,
তোমরা পেলে শাশ্বতেরে
আমরা র'লাম অ-স্থিতে।
গাও গাও হে সৈনিক, সংগীতের সুধা
দাও ঢালি চিতার উপর, ভক্তি অর্ঘ্য
দীনা ধরিত্রীর।

* * *

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

(দ্বারকার উপকণ্ঠে)

* * *

অর্জুন। কোথায় দ্বারকানাথ? কোন্ ত্যক্তপুরে
চিতাময় জনপদে আনিলে সারথি?
নিশ্চয় ভুলেছ পথ।

দূত। দেব
দ্বারাবতী অন্ধকার। যদুকুল পতি
অন্তর্ধান। অন্তর্হিত বীর বলদেব।
এ বিজন পুরী মাঝে আছে শুধু নারী!
আছে শিশু, বীর নাই। আর আছি আমি
শুনাতে নির্মম কথা।

অর্জুন। (স্বগত) হলনাকো দেখা।
মনে পড়ে আজ শুধু সেই মুখখানি
ফুল্ল নীল অরবিন্দ, সেই ঘামে ভেজা
দীন সারথির বেশ। আজ আমি একা
একান্ত বান্ধবহীন। ও কি ও গম্ভীর,
সাগব গর্জন আজি। নীল ঊর্মি 'পরে
ভেসে আসে স্বর্ণ তরী, রয়েছে শয়ান
ওই সেই শ্যামতনু। কোথা স্বর্ণ তরী?
ও যে রমণীর মূর্তি, মেলি স্বর্ণ পাখা
সোহাগে আবরি নিল বীরে বক্ষে তার
শ্যামদ্যুতি! কি মধুর ও কি ও মিলন!
কোথা কই নারী মূর্তি, ও যে হেমতনু
মোহন নাগর বর, চাঁচর চিকুর।

ও কি সন্ন্যাসী ও যে, পরনে কৌপীন
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে! কিন্তু সেই আঁখি,
সেই বিম্বাধর। বাজিছে মৃদঙ্গ
এই উঠে হরিনাম। নাচে বিনোদিয়া
নাচে তরী, তারি সনে নাচে সিন্ধুনীর
উদ্দণ্ড নর্তনে। ওই ভেসে গেল তরী,
ওই কনকের পাল দিনান্তে মিশায়,
এখনো যেতেছে দেখা, আমার সখার
ওই যেন হস্তের ইঙ্গিত।

* * *

তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

(দ্বারকার উপকণ্ঠে)

* * *

(অর্জুন দণ্ডায়মান)

অর্জুন। আজ মোর মনে পড়ে এই পথ দিয়া
গেনু সুভদ্রায় লয়ে! বকুলের তলে
স্ফটিক-বেদিকা ওই যেথা সখা সনে
রমণীয় অপরাহ্ন মৌনতা মুখর
করেছি যাপন সুখে। ওই তরু শাখে
জাগে হিন্দোলার দাগ, শৈশবের স্মৃতি
প্রৌঢ়প্রাণে।

(সারথির প্রবেশ)

সারথি। সুসজ্জিত রথ আজি। পুর অঙ্গনারা
রয়েছে অপেক্ষিয়া। ত্যাজি দ্বারাবতী
নগরীর উপকণ্ঠে হস্তিনার পথে--

অর্জুন। হও অগ্রগামী। আমি মিলিব সত্বর।

(সারথির প্রস্থান)

চলুক নীরবে বিষাদের শোভাযাত্রা
সমাধির পুষ্পরাজি সযত্নে আহরি
লয়ে যাই ইন্দ্রপ্রস্থে। বিসর্জন শেষে
প্রতিমার সাজ-সজ্জা ছিন্ন করি লয়ে
শিশু যথা যায় ঘরে।
(সবিস্ময়ে) একি, একি!
ওই আসি সাগরোর্মি ঘূর্ণিবায়ু সনে
অর্ধেক গ্রাসিল পুরী! ওই ডুবে গেল
প্রলয়ের কালোমেঘে শারদ চন্দ্রমা।

সাগরের অশ্রু রসাঞ্জনে গলে গেল
দ্বারাবতী। ডুবে গেল ওই সৌধ রাজি।
ডুবে গেল রঙ্গালয়, রাজ পান্থশালা।
বজ্রদৃঢ় দুর্গ শিরে ওই দিল হানা
স্ফীতবক্ষ মহার্ণব শঙ্খ বাজাইয়া।
কলাভবনের 'পর প্রলয়ের তুলি
বুলাইল পারাবার। সংগীত শালায়
সাগরসঙ্গীত জাগে। বিলাস-ভবনে
নৃত্য করে নক্র-তিমি। অন্তঃপুর মাঝে
শুক্তি পাতিয়াছে শয্যা। শুধু জেগে আছে
স্নিগ্ধ শুভ্র অমলিন মন্দিরের চূড়া—
ধর্মের বিজয়-কেতু প্রলয়ের মাঝে।
সখার সে শ্যাম ভালে তিলকের মতো
স্বেদার্দ্র সুন্দর।
বিদায় বিদায় সখা! পুনঃ দেখাইলে
এ নূতন বিশ্বরূপ! আর কি দেখাবে
প্রেমময়? কোন্ রূপে দেখা দিবে পুনঃ,
কোন্ ব্রজে পড়িয়াছে ডাক!

(গীত)

সময় হল ডাক পড়েছে নদীয়ায়
ওই বাঁশরি শুনা যায়।
আজকে রাইয়ের চন্দ্রাননে,
পড়ছে মনে, পড়ছে মনে
পড়ছে মনে কুঞ্জবনে
ধরা তাহার দুটি পায়।
মনে যে আজ পড়ছে ভালো,
বর্ষা যখন ঘনিয়ে এল
মেঘের ডাকে থির বিজলি
শ্যাম নীরদে মিশে যায়।
শুধাই হে শ্যাম কখন চুপে
ঢাকলে ও রূপ রাধার রূপে,
ডুব্ল কালো কনক আলোয়
ডুব্ল অসীম সুষমায়।
সময় হল ডাক পড়েছে নদীয়ায়
ওই বাঁশরি শুনা যায়।

রজনীগন্ধা

গন্ধ তোমার মধু শান্ত গভীর,
অন্ত না পায় খুঁজি সান্ধ্য সমীর।
    বক্ষ অতল তব,
    সিন্ধু ক্ষীরোদ নব,
মৌন প্রেয়সী তুমি মুগ্ধ কবির।
তব পরিমল পুরী উন্নত শির।
অন্দর মাঝে মহা উৎসব ভিড়।
    লাগে চেনা চেনা ওই,
    চিনিতে পারিনে কই,
পরিচিতি আসে কাছে বেশে অতিথির।
কত কথা কয় তব চঞ্চল বাস,
কানে যায় আলাপে অস্ফুট ভাষ।
    কথাহীন শুধু সুর
    হিয়া করে ভরপুর
পরানে গোপনে পাই প্রেমেরি আভাস।

দুঃখের রাজ্য

সেথা রবি ওঠেনাকো পড়ে যায় বেলা রে।
হয়নাকো বেচাকেনা ভেঙে যায় মেলা রে।
        সেথা শুধু কাঁদে সীতা
        জ্বলে সতী, জ্বলে চিতা
গাঙুরের নীরে ভাসে বেহুলার ভেলা রে।

সেথা ধায় আঁখি-নীর গিরি শির গলায়ে
সেথা যায় ভুখারির পোড়া শোল পলায়ে

সেথা উঠে হা হা বাণী,
শ্মশানেতে রাজারানী,
সেথা শুধু উৎসব নব চিতা জ্বালায়ে।

সেথা জাগে দুর্বাসা কপিলের সহিতে
অভিশাপ কহিতে ও কোপানলে দহিতে।
সেথা ভোঁ ভোঁ বাজে শিঙা
ডোবে মাঝি ডোবে ডিঙা
সেথা গেলে অপ্সরী তীর্থের রোহিতে।

তবু সুরধুনী এল সে দেশের লাগি রে
চীর পরি যুবরাজ তারি অনুরাগী রে
সেথা থামে আনাগোনা
তরী সেও হয় সোনা,
পাষাণও মানবী হয়ে কথা কয় জাগি বে।

তারি লাগি বারে বারে হয় তাঁরে আসিতে
নাশিতে শাসিতে অরি তারে ভালোবাসিতে
শুধু তারি আঁখি জল
যমুনায় আনে ঢল,
সেই দেয় নব সুর কৃষ্ণের বাঁশিতে।

কৈশোর

১

সেথা সোনালি ও রাঙা রাঙা কচি কিশলয়,
সেথা অবুঝের সবুজের নব অভিনয়।
সেথা গুল্ বুল্বুল্
করে পয় পয় ভুল;
দোলে তুলতুলে ঢুলঢুলে বন ফুলচয়।

২

সেথা লালিমায় টুকটুকে অধরের লাল
সেথা আলোকের চুমা চায় গোলাপের গাল।

সেথা	পাপিয়ার সুর
ঢালে	সুধা ভরপুর
সেথা	ফেলে চুপ, অপরূপ রূপ শরজাল।

৩

সেথা	কমলের পুরে বাজে প্রণয়ের বীণ,
সেথা	আবছায়ে পরীদের নাচ্ রাত দিন।
জাগে	উৎসব রব,
সেথা	উদ্দাম সব,
সেই	পুলকের অলকাতে সকলি নবীন।

৪

সেথা	ফুলধনু ধনু লয়ে সঙ্কোচে ধায়
সেথা	উমা-মুখ-শশী পানে সদাশিব চায়।
সেথা	হাসে বধূ-বর
নাচে	কিন্নরী নর
দেখে	দেবতারা আসি হাসি গগনের গায়।

৫

সেথা	বাসেরি আভাস দেয় মঞ্জরিতে
নহে	বীতরাগ অলিকুল গুঞ্জরিতে।
সেথা	অশ্রুলালোক
করে	চঞ্চল চোখ
ছোটে	রামধনু আঁকা পথে সঞ্চরিতে।

ফাটলের ফুল

পাষাণ চেয়ে পাষাণ প্রাচীর তাহার কঠিন গাত্রে,
কেমন করে ফুল ফোটালে একটি বাদল রাত্রে।
একটি নিশির শব সাধনে এমন মহাসিদ্ধি
রূপ সাগরের প্রবাল দ্বীপের এমনি কি হয় বৃদ্ধি?
রুদ্র নভে করলে কে এই রামধনুকের সৃষ্টি,
তীব্র শোকের উগ্র বুকে এ কার সুধা দৃষ্টি!
আনলে কে এই ভাবের জোয়ার এমন নীরস গদ্যে,
'নূর জাহানের' জন্ম এ যে উষর মরুর মধ্যে।

শিশু রাজ্য

সেখানে আকাশ রাঙা রাঙা রবি ওঠেনি
কমলেরা চোক মাজে এখনও ফোটেনি,
ডাক শেষে শাবকেরা বসি নিজ কুলায়ে
বহে শিশু সমীরণ লতিকারে দুলায়ে।

২

কথা সেথা ভাঙা ভাঙা রাঙা রাঙা অধরে,
প্রাচীরের বাধা নাই অন্দরে সদরে।
সুর ফাঁক সংগীতে হার মানে বাঁশরি
তালহীন নৃত্যেতে তন্ময় আসরই।

৩

সাজ সেথা নগ্নতা, কাজ সেথা অকাজে।
তারি সনে বাধে রণ প্রিয়তম সখা যে,
হাস্যেতে যত শোভা, তত শোভা রোদনে,
বিজয়ায় যত ধুম, তত ধুম বোধনে।

৪

রূপ সেথা সেধে পরে কুরূপের ভূষাকে,
কুহেলিতে ঢেকে রাখে শরতের উষাকে।
সেই দেশে গজ গেলে শতদল-বাসিনী
আজও সেথা কমলার, পেচকেরা আসেনি।

৫

নবনীর অবনী সে লাবণির খনি গো,
উঠে ব্রজ রাখালের নূপুরের ধ্বনি গো।
ফুটে সেথা গোলাপের কচি মুখ হসিত
জাগে সদা যশোদার আঁখিযুগ তৃষিত।

৬

ক্ষীর সেথা স্রবি পড়ে শ্যামলীর বাঁটেতে,
বিনা দরে কেনাবেচা সোহাগের হাটেতে
মরালেরা ঘোরে সেথা, বীণা সাধে ভারতী,
ভূলোক দ্যুলোক করে পুলকের আরতি।

পুরানো চিঠির ফাইল

এটা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি মুছে গেছে আঁখরগুলা যত,
রঙটি রাঙা তেমনি আছে লেগে অতীত বিয়ের পাক চূণারি মতো।

২

এ যে বড়ই গরম গোছের চিঠি চেয়েছে কার সাতাশ টাকা বাকি
কাঠ্ ঠোক্‌রা কোথায় গেছে উড়ি নীরস শাখায় ঠোকর কটা রাখি।

৩

এখান যে হায় আনন্দেরি লিপি পরীক্ষাতে প্রথম পাশের খবর
লাভের চেয়ে আনন্দটাই বেশি কাঁকুর চেয়ে বীজটা তাহার জবর।

৪

এ কি এক আদালতের শমন মুড়কি সাথে বোলতা কেন হেরি
সাপ গিয়েছে খোলসাখানা রাখি ফুলে এ ছুঁচ মিশ্‌ল কেমন করি।

৫

এ চিঠিটা লিখছে বাড়ির ছেলে ইস্টিশানে পাঠিয়ে দিতে গাড়ি
ছেলের এখন বহুত ছেলেপুলে ঠাকুরদাদা চিনতে তাঁরে পাবি!

৬

এখানা এক ঔষধেরি লিপি আসতেছে এক ঔষধালয় হতে
কাল করেছে পাঁচটি টাকা ভি পি অনুরোধটা শীঘ্র সেটায় নিতে।

৭

এখানা এক আত্মীয়েরি চিঠি চেয়েছে হায় ত্রিশটি টাকা ধার
দেখছি তাহার শীর্ণ হাতের পাতা পাওয়ার কোনো খবর নাহি আর।

৮

কোণটি ছেঁড়া শোকের খবর এটি অতীত ভোলা সুদূর বুকের ব্যথা,
ছেলের গলায় সোনার হারের সাথে কেন রে এই বাঘের নখর গাঁথা?

তৈজসের ইতিহাস

এই থালাখান দাদুর বিয়ের দানের সময় পাওয়া,
ওর উপরই কর্তা-মায়ের বিশেষ ছিল দাওয়া,
পড়লে কারো হাত হতে ও, সইতনাকো তাঁর,
তোরঙ খুলে তুলতে যেতেন দিনে শতেকবার।

২

গয়াধামের গয়েশ্বরী, বৃন্দাবনের বাটি
পয়মন্ত জিনিস বড়, যায়নি আজও ফাটি;
লক্ষ্মীছাড়া গামলাখানা, ডাল ঢালা হয় যাতে,
এসেছিল ভাগ্যহীনা খুড়ি-মায়ের সাথে

৩

বাঁটলোটিতে দাদুর মায়ের সাধের পায়স রাঁধা,
দুষ্টু রাখাল লুকিয়ে নিয়ে পরকে দিলে বাঁধা,
হয় যে বাবার অন্নপ্রাশন ধুমধামেরি সাথ,
এই বগিথাল এতেই বাবা প্রথম খেলেন ভাত।

৪

বোগ্‌নোটি ওই—বেশ যে মনে পড়ছে আজি মোর-
চৌধুরিদের মধ্যমেরি বিয়ের বিলানোর।
তৈল ভরা বোগ্‌নো আহা মোণ্ডা—ভরা ঠোলা,
অনেকদিনের কথাই বটে, যায় না তবু ভোলা।

৫

তুবড়ে-যাওয়া দাগ-ধরা ওই গঙ্গাজলী ঘড়া
মায়ের হাতে পড়্‌ল কুয়োয় টানতে গিয়ে দড়া।
তখন তিনি দশ বছরের ন-বসতের কনে,
কেঁদেছিলেন কুয়োর ধারে মহাপ্রমাদ গণে।

৬

ছক্‌কাটা ওই পানের বাটা ফুলশয্যার দান,
বাবার বাবার ঠাকুরমা সে সাজত ওতেই পান।
খাগড়ায়ে ও পানের ডিবে, ময়লা ধুলা ঢাকা,
দেখ্‌লে চোখে জল যে আসে কাকার স্মৃতি মাখা।

৭

প্রকাণ্ড ওই পুষ্পপাত্র বার করিতে মানা
এই ভিটারই বাস্তুযাগের জন্যে প্রথম আনা।
মুখ-আঁটা যে কমণ্ডলু যত্নে দিলাম রেখে,
আনেন সেটি জেঠাইমা যে বদ্রী-নারাণ থেকে।

৮

ঘরের প্রতি তৈজসেতে, রাঙঝালেরই ওব
লেগেই আছে কতই শত উৎসবের-ই জোড়,
কাঁসারি চায় বদলে নিতে আসছে প্রতি মাস
গৃহস্থলির তাম্রলিপি, স্নিগ্ধ ইতিহাস॥

নূপুর
১৯২০

ব্রজদাস

কালাপাহাড়ের কাল অভিযানে আজি ব্রজপুর ধ্বস্ত,
দেবতা ফেলিয়া পাণ্ডার দল ছুটিয়া পলায় ত্রস্ত।
সারা ব্রজধামে দীন ব্রজদাস
মন্দিরে একা করিতেছে বাস,
দেবতা সমুখে বসিয়া রয়েছে কুসুমাঞ্জলি হস্ত।

২

দেব মন্দির সুরভিত আজি ভুরু ভুরু ধূপ গন্ধে।
প্রভাত আরতি করি ব্রজদাস প্রাণ ভরি পদ বন্দে।
ভক্ত আজিকে একি রে বিভল
টস্ টস্ করি পড়ে আঁখিজল,
তৃষিত ভ্রমব পান করে যেন শ্রীমুখের মকরন্দে।

৩

সাজায়ে সাজায়ে খেদ নাহি মিটে আবার সাজায় ভক্ত
শিশুকাল হতে রাধারমণের সে যে চির অনুরক্ত
হাতের বাঁশিটি করি দেয় বাঁকা
হেলাইয়া দেয় ময়ূরের পাখা,
বাঞ্ছিত চির চরণে বুলায় করবীপরাগালক্ত।

৪

অঙ্গনে ওই ঢুকিল সৈন্য করেতে করাল দণ্ড
উপাড়ি ফেলিছে তুলসীর মূল করিছে লণ্ডভণ্ড।
পূজায় মগন ধীর ব্রজদাস
বুঝিনে বহে না বহে নিশ্বাস,
প্রেম আঁখিনীরে ভাসিয়া যেতেছে পাণ্ডু যুগল গণ্ড।

৫

মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়ে পাহাড় হাঁকিয়া বলিল তূর্ণ
বুকেতে তাহার ভীম বিদ্বেষ নয়ন রোষেতে পূর্ণ।
চাহিয়া বারেক ব্রজদাস পানে
বলিল মির্জা রহ এইখানে
পূজাশেষে এই পাষাণ ছবিটা পদাঘাতে করো চূর্ণ।

৬

প্রহরের পর প্রহর কাটিল হয় না যে পূজা ভঙ্গ,
সাধক আজিকে লভিয়াছে বুঝি চির আরাধ্য সঙ্গ।
চাহিয়া চাহিয়া দেখি সেনাপতি
মনে মনে হায় করিল যে নতি,
পরানে তাহার কি ব্যথা জাগিল পুলকিত হল অঙ্গ।

৭

ফিরিয়া আসিল সে কালাপাহাড় সাথে সেই সেনাবর্গ,
রোষ কষায়িত নয়ন সাগর করেতে দুলিছে খড়্গ।
দেখি পূজারিরে স্থির নিশ্চল
কঠোর নয়ন হল ছলছল,
বুঝিল ভক্ত জীবন তাহার দেবেরে দিয়েছে অর্ঘ্য।

৮

মির্জার পানে চাহিয়া দেখিল সেও সে সংজ্ঞাশূন্য
কালাপাহাড়ের পাষাণ-হৃদয় বারেক হইল ক্ষুণ্ণ।
বলে বিচিত্র চিত্র যে হেতা
চিনিতে নারিনু কোন্‌টি দেবতা
বুঝিতে পারিনে দেবতা নরের কাহার অধিক পুণ্য।

৯

আমি তো জানিনে দেবতা কোথাও রক্ষা করেছে ভক্তে।
ভক্ত দেবেরে অমর করেছে আপন বক্ষ রক্তে।
এসেছে দেবতা আজি মন্দিরে
যেতেছি ফিরিয়া পদ বন্দি রে
সাধু মির্জারে চল লয়ে চল শোয়াইয়া হেম তক্তে।

শ্রীধর

সন্ন্যাসী সাজি শ্রীধর চলেছে বদ্রীনাথের পথে—
আমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর চিনিবে না কোনোমতে।
পাঠশালে তার ছিল হাতটান, দৃষ্টিও ছিল খর,
'নষ্টচন্দ্রে' কত ফলমূল গোপনে করিত জড়ো।
একদা তাহার মরেছিল যবে পোষা এক শুকপাখি,
দু-দিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল বনে বনে তারে ডাকি।
পালিত যতনে বিড়াল কুকুর পশুপাখি নানা জাতি,
জানিনে তো মোরা কবে হতে হল সাধু ফকিরের সাথী।

ছাড়ি যোশীমঠ চলেছে শ্রীধর শ্রীধামের অভিমুখে,
'পরশ পাথরে' গঠিত ঠাকুর বারবার জাগে বুকে।
সিনান করিয়া মন্দিরে যবে প্রবেশে হৃষ্টমতি—
দৃষ্টি পড়িল দেবতা গলের মুক্তামালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার কুভাব আসিল মনে,
দেখিয়া শ্রীমুখ কাঁদিল হৃদয়, কাঁপিল শরম কোণে।
দু-দিনের পর বিদায়ের দিনে হস্তে ধরিয়া থালা—
রাওল ঠাকুর আসিলেন লয়ে সেই সে মুক্তামালা।
বলিলেন ধীরে জড়ায়ে আদরে শ্রীধরের দুটি পাণি,
বদরীনাথের পরমভক্ত আপনি তাহা কি জানি।
দেবের আদেশে দেবের এ মালা উপহার দিনু করে,
শুনিয়া শ্রীধর কাঁপিয়া উঠিল বিস্ময়ে লাজে ডরে।
কম্পিত করে মুকুতার মালা গ্রহণ করিল যবে—
পদধূলি নিতে করে কাড়াকাড়ি সাধু সন্ন্যাসী সবে।
ছল ছল চোখে চলেছে শ্রীধর প্রতি পদে পদ টুটে
যতনে তাহারে ধরে লয়ে যায় গাড়োয়ালি এক মুটে।
নিজের দীনতা ভাবিয়া শ্রীধর পারে না রোধিতে বারি,
লাগিতেছে আজ মুকুতার মালা পাষাণের চেয়ে ভারী।
এমনি হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনি জাদু
কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয় তস্করও হয় সাধু!
শ্রীধর তখন মুছি আঁখিনীর বলিল, রে মন তবে—
এখন হইতে যাঁর মালা তাঁর সন্ধান নিতে হবে।
সংসার ছাড়ি এ মণির মালা কী করিবি তুই নিয়ে,
দেখা হলে পর তাহারে চাহিবি তার ধন ফিরে দিয়ে।

বরষের পর শ্রীধর চলেছে বনপথ দিয়া ধীরে
গঙ্গোত্রীর বারি চড়াইতে রামেশ্বরের শিরে।
দেখিল পথেতে সঙ্গী জনেক পতিত নকুলে তুলি,
ক্ষত দেহে তার বুলাইছে হাত যতনে ঝাড়িছে ধূলি।
তৃষিত ওষ্ঠ ভিজায়ে দিতেছে কমণ্ডলুর নীরে,
তাপিত তনয়ে কাঁধে লয়ে যেন জনক চলেছে ধীরে।
কিছু দূরে গিয়া দেখে পড়ে আছে ডানা ভাঙা এক পাখি,
সন্ন্যাসী তারে কোলে তুলে নিল নকুলে ঝোলায় রাখি।
মুখে দেয় জল বুকে চেপে ধরে মুখ পানে চেয়ে কাঁদে
ভাঙা পাখা তার উত্তরী ছিঁড়ি সরু সূতা দিয়া বাঁধে।
পথের পাশেই সাধুর আবাস, শ্রীধরে ডাকিল সেথা,
বাজিতে লাগিল শ্রীধরের প্রাণে সুদূরের কোনো ব্যথা।
দেখিল সেখানে পদহারা গাভী ষণ্ড মহিষ জরা—
পিঁজরাপোল কি আশ্রম তাহা যায় না সহজে ধরা।

সজল নয়নে শ্রীধর বলিল, ওহে সন্ন্যাসী ভায়া!
সংসার দিয়ে পশুশালা নিলে এমনি দারুণ মায়া?
সন্ন্যাসী বলে কী করি ঠাকুর, বাঁধন নাহি যে টুটে,
নীরব বেদনা আমার পরানে সাধনা হইয়া ফুটে।
জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি বলিতে পারিনে ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হয়ে গেছে জীবালয়ে দেবালয়ে।
শুনিয়া শ্রীধর তাহারে বলিল, হাসি, করুণার হাসি—
কাহার লাগিয়া কোথা পড়ে রবে, কাহার লাগিয়া আসি?
সন্ন্যাসী বলে, মায়াজালে আমি জড়ায়ে পড়েছি অতি
ভালো মনে হল, এক কাজ কর দয়া করে মোর প্রতি।
হৃষিকেশ যেতে কুড়ায়ে পেলাম একটি মুকুতা আমি,
জানি না কাহার মরি খুঁজে খুঁজে জানে অন্তর্যামী;
শুনেছি সাধুর মালা হতে তাহা অজ্ঞাতে গেছে খসি
রামেশ্বরেতে যাবে সেই সাধু তারি লাগি আছি বসি।
এত বলি হাসি মুকুতাটি দিল আনি শ্রীধরের হাতে,
বলিল তাহারে, ফিরে দিয়ো তুমি যদি দেখা হয় সাথে।
শ্রীধর আপন মুকুতার মালা যতনে বাহির করি
দেখিল তাহার একটি মুকুতা কেমনে গিয়াছে পড়ি।
পুলকে সাধুর হাত দুটি ধরি কাঁদিয়া বলিল, ভাই,
কেমনে আমার করিয়াছ খোঁজ তব অসাধ্য নাই।

এ মুকুতা হারও পরের জিনিস, নাম তার আছে লেখা,
ধর মালা ধর, দিয়ো মালিকেরে, যদি পাও তার দেখা।
রাখি মালাগাছি, হরষে শ্রীধর চলে গেল নিজ কাজে,
সন্ধানী হাতে সঁপিয়াছে মালা তৃপ্তি যে হিয়া মাঝে।

জানিনে তো আমি কী করিল সাধু লয়ে সে মুকুতা-মালা,
হয়েছে সেখানে গ্রাম জুড়ি এক পশু-চিকিৎসা-শালা।
মূক প্রাণীদের যতন করিতে রোগে ঔষধ দিতে—
ব্রহ্মচারীরা মগ্ন সেথায় সদা আনন্দ চিতে।
দেববনে বলে আছে দুটি সাধু শুনেছি তাদের কথা,
পীড়িত পশুর গায়ে হাত দিলে জুড়াইয়া যায় ব্যথা।
সাঁঝে দুইজনে বসে যোগাসনে স্মরিয়া জীবের জ্বালা
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি-দ্রব-মুকুতার মালা।

অজয়

গঙ্গা আমার পুণ্যতমা সরিৎরূপা দেবী
মৃত্তিকাতে অমৃত তাঁর, পুণ্য সলিল সেবি,
স্তোত্র তাঁহার গাইতে আমার কুলায়নাকো ভাষা,
ধন্যা হরি পাদোদ্ভবা অন্তিমেরি আশা।
তিনি গীতা, গায়ত্রী মোর, আরাধনার ধন,
সাত পুরুষের স্বর্গ আমার, নিতান্ত আপন।
কিন্তু মায়ায় কীট যে আমি বলতে পারি কি?
উজানি ও অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

২

যমুনা নাম করতে আমার শিউরে উঠে গা,
নামে আনে বৃন্দাবনের পরাগ বহিয়া।
আরাধ্যেরি আরাধ্য মোর, প্রাণের আমার প্রাণ,
তরঙ্গিত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের গান।
আমার শ্যামের বংশীধ্বনি, গোরার আঁখি জল,
স্বপ্নে আমার কর্ণে পশে মধুর কলকল।
কিন্তু মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৩

সরযূ যে অমৃতময় আমার রামায়ণ,
ব্রহ্মা না হক বাল্মীকিরই কমণ্ডলুর ধন।
সীতা রামের গাহন পূত, অপার্থিব নীর
নামেতে হয় পুণ্য দেহ, ধুলায় লোটে শির।
ত্রেতার স্মৃতি, জেতার স্মৃতি, ত্রাতার স্মৃতি সে
বুকের মাঝে জপ করি পাই শক্তি নিমিষে।
কিন্তু মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৪

বিশ্ব প্রেমিক নইকো আমি, শক্তি নাহি হবার
দুর্বলতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা মাগি সবার।
ক্ষুদ্র আমি বিরাটকে তাই ক্ষুদ্র ছবি করি,
আরাধনায় বুকের মাঝে নিত্য রাখি ধরি।
ক্রুদ্ধ কেহ হবেননাকো ক্ষম্য অভাজন্
ক্ষুদ্র গ্রামের চৌসীমানায় রুদ্ধ আমার মন।
অভয় মাগি মনের কথা বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৫

অজয় আমার ভাঙবে গৃহ, হয়তো দু-দিন বই
তবু তাহার প্রীতির বাঁধন টুটতে পারি কই?
সে তো কেবল নদ নহেকো, নয়কো সে তো জল,
সে যে তরল গীত-গোবিন্দ চৈতন্য-মঙ্গল।
সে যে আমার চণ্ডী-দেবীর চরণ-অমৃত,
বনকে করে শ্যামল এবং মনকে সমৃদ্ধ।
দুঃখ এবং দৈন্য মাঝে বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

বকুলতরু

পাঁচশো বছর হেথায় ছিলে প্রাচীন বকুলগাছ,
অজয় নদের ভাঙনেতে পড়লে ভেঙে আজ।
কালও ছিলে নিবিড় শ্যামল লোহার মতো দৃঢ়
ফুলের রাজা প্রফুল্ল মুখ লাখো পাখির গৃহ।
কালও ছিল সত্র তোমার জমাট মনোহর,
সারা দিবস অতিথ ভ্রমর গুঞ্জন মুখর।
কালও ছিল তোমার তলে ছেলে মেয়ের ভিড়,
আজকে নত নদীর জলে অভ্রভেদী শির।
সিদ্ধ তুমি না হও মোদের বৃদ্ধ বকুল গাছ,
বক্ষ উঠে টনটনিয়ে চললে তুমি আজ।
তুমি মোদের অক্ষয় বট তুমি বোধিদ্রুম,
মাতামহের পিতামহ তোমায় নমো নমঃ।

শৈশবেরি গোকুল তুমি স্নেহের ব্রজধাম,
বার্ধক্যেরি প্রভাস তুমি পুণ্য তব নাম।
অক্ষরণের কুরুক্ষেত্র দেখলে হত ভ্রম
রামায়ণের তুমিই মোদের বাল্মীকি আশ্রম।
পুরাণের নৈমিষারণ্য তুমিই ব্যাসাসন—
সংকীর্তনে তুমিই মোদের শ্রীবাস অঙ্গন।
তুমিই মোদের সুহৃদ সখা তুমি গুরুর গুরু।
হল তোমার চরণ তলেই ভক্তি জীবন শুরু।

২

লোচন দাসও তোমার তলে করেছিলেন খেলা
বাদল দিনে নালার জলে ভাসিয়েছিলেন ভেলা।
তোমার ফুলে মালা গেঁথে ছেলে খেলার ছলে
অলক্ষ্যেতে পরিয়েছেন বনমালীব গলে।
তোমার তলে পড়িয়াছে তাঁহাব চোখের জল
তুমিই প্রথম শুনিয়াছ চৈতন্য মঙ্গল।
কাছেই তোমার শিবের দেউল তুমি মোদের কাশী।
ঘরের কাছেই স্বর্গ মোদের তোমায় ভালোবাসি।

৩

শুনিয়াছ যুগের যুগের ছেলেমেয়ের কথা,
উৎসবেরি আনন্দ ও ভাঙা বুকের ব্যথা।
প্রাচীনতম বাসিন্দা যে তুমি গ্রামের বুড়া
একটি তোমার চুল পাকেনি চির শ্যামল চূড়া।
সুদূর থেকে তোমায় দেখে উঠত ভরি বুক,
তুমিই সবার গৃহস্বামী আদর মাখা মুখ।
আজকে তোমার স্বর্গারোহণ ওগো বনস্পতি।
আজকে গোটা গ্রামের অশৌচ গোটা গ্রামের ক্ষতি
মনে পড়ে তোমার স্নেহ তোমার শীতল ছায়া
মনে পড়ে ফুলের সুবাস, স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া।
জমছে মনে হারিয়ে যাওয়া চেনা মুখের ভিড়
প্রিয় জনের বিচ্ছেদেরি যন্ত্রণা নিবিড়।

৪

তুমি গোটা গ্রামের দায়াদ অযুত নাতি পুতি,
চোখের জলে স্বর্গগামী করি তোমার স্তুতি।
নন্দনেতে ঠাঁই হবে হে কল্পতরুর কাছে,
গ্রামের তরুণ বৃদ্ধ বালক স্বর্গ তোমার যাচে।

স্বর্গ থেকে বকুলতরু মর্ত্যপানে চেয়ে,
আশীর্বাদী তোমার ফুলে বুকটি দিয়ো ছেয়ে।
মিত্র ও দৌহিত্র তোমার ভুলতে তোমায় নারি,
আমায় কোরো তোমার প্রেমের উত্তরাধিকারী।

পল্লী-শ্রী

মূর্খ গরিব নামহীন মোর মা হয়েই তুই থাকলি মা।
সব দিকে আমি ছোট বলে তুই আগলিয়ে কোলে রাখলি মা।
পাঠাবি কোথায় নাহি সৌরভ তুলিবি কোথায় নাহি গৌরব
পরে নিলেনাতো ঘরে রেখে দিলি তাই তো আমারে পাগ্‌লী মা।

২

তোরি আঁচলের খুঁট ধরে যাই, ভরা অজয়ের ঘাট পানে;
তোরি পাদমূলে দাঁড়াইয়া চাই রামধনু আঁকা মাঠ পানে।
মন্দিরে তোর সাথে সাথে যাই, পীযুষ প্রসাদ হাত ভরে পাই,
ভগবতী যার সুমুখে তাহার বৃথা ভাগবত পাঠ কেনে?

৩

দিয়ো না আমারে দরবারে যেতে দুরু দুরু কাঁপে বক্ষ মা,
আছে শুধু দীন দুর্বল দুখী অক্ষম সাথে সখ্য মা।
জ্ঞানাঞ্জনের শলাকার ভার জলভরা চোখ সবে না আমার,
কাজল-লতার কাজলে তোমার জুড়াও নয়ন, রক্ষ মা।

৪

তুই গড়ে দিস্ পাতার টোপর সোনার কিরীট সেই মা মোর,
তোর আঁচলের মধুর বাতাস আয়াস করে কি পায় চামর!
পারিনে পুঁথির ওলটাতে পাত, দিই শিস, শ্যামা পাপিয়ার সাথ,
গুণ না থাকুক, গুন গুন করি বেড়িয়া ও পদ ওই ভ্রমর।

৫

যেন মা তোমার স্নেহের দীঘিতে কমলের সাথে নাইতে পাই।
যেন মা তোমার বিপিন ভবনে পাপিয়ার সাথে গাইতে পাই।
চন্দন সাথে যেন রোজ রোজ পরশি মা তোর চরণ সরোজ,
যেন মা তোমার চাতকের মতো হরির করুণা চাইতে পাই।

এস

এস গোটা এ বাগান আলো করা ফুল অনিমেষ পথ চাওয়া,
এস খর নিদাঘের হৃদয় জুড়ানো সজল মলয় হাওয়া।
তুমি সাগরের শেষ সীমা হে,
তুমি ধু ধু মাঠে শ্যামলিয়া হে,
তুমি দুখের প্রবাসে বুকের সে গান বহুদিন ভুলে যাওয়া।

২

এস ভাঙা এ বুকের রাঙা রাঙা দাগে গোপন চরণ ফেলে,
এস কমলদীঘিতে নব অরুণের অনুরাগ আঁখি মেলে।
এস নব আষাঢ়ের ঘন ঘোর,
এস চির মধুময় বঁধু মোর,
এস মরুর পরেতে তরুর মমতা ফুলে ফুলে পথ ছাওয়া।

৩

এস তমালের ডালে বহুদিন পরে, ঝুলুক ঝুলন ডুরি.
এস শিস দিয়ে ডাকা কপোতের ঝাঁকে ফাঁকে ফাঁকে দোঁহে ঘুরি।
এস এস মুখভরা মধুনাম,
এস এস হে নয়ন অভিরাম,
এস বুক ভরা ধন, সোনার স্বপন আপন করিয়া পাওয়া।

ক্ষণের সঙ্গী

ক্ষণিক যারা এক নিমিষের সাথী,
বণিক তারা অচিন পথের চেনা;
যাদের সাথে কাটল প্রহর রাতি,
তাদের সাথে চোখের লেনা-দেনা।

২

পথের পাশে বনের হরিণ যত
চকিত চেয়ে পালায় তারা ছুটে,
গবাক্ষেরি বদন কমল মতো
লাজুক যারা ফুটেই পড়ে টুটে।

৩

মরুর পথে ফুলেল বনের হাওয়া,
ঘোমটা-ঢাকা মুখের মৃদু হাসি,
শিস দিয়ে ওই শ্যামার উড়ে যাওয়া,
উড়িয়ে দেওয়া কদম রেণু রাশি।

৪

পলাতক ওই আগন্তুকের দল,
নিমেষ মাঝে আলাপ করে যায়,
ঠাঁই-ঠিকানা কিছুই নাহি বলে,
ভিড়েই তরী নিরুদ্দেশে যায়।

৫

কোথায় কালের অতিথশালে হায়,
ওরা সবাই রাত্রি করে বাস;
ধর্মশালায় বাউলগীতি গায়,
দেখতে ফিরে হয় যে বড় আশ!

৬

বুঝতে নারি কোথায় তাদের ঠাঁই—
হিমালয়ের ভূর্জবনের ছায়,
সে কোন্ মহা কুম্ভমেলায় ভাই
আবার তাদের নাগাল পাওয়া যায়!

গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড

চলিয়াছ তুমি সড়কের রাজা কলিকাতা হতে পেশবার
সুবিধা পেয়েছ কত নদ নদী নগরীর সাথে মেশবার
আঙুর পেস্তা কিসমিস
পেতে জিভ করে নিশপিস
ডাকে খাইবার গিরিপথ, ডাকে ডাকিনী এলায়ে কেশভার!

২

পাকুড় পাথরে চুনার আদরে কাঁকরে কাঁকরে ছয়লাপ,
কোথা কালো কোথা শুভ্র পাংশু কোথা লাল করে জয়লাভ।

পথে পথে ছায়া ছত্র
হরিণ হরিৎ পত্র।
সিন্ধু বরুণা গঙ্গা যমুনা দর্শনে হরি লয় পাপ।

৩

কোথাও গো গাড়ি আদার ব্যাপারি জাহাজের খোঁজে চলছে,
টোঙা এককা পালকি লক্কা টলছে।
ছুটেছে অশ্ব দুষ্ট,
উষ্ট্রের দল পুষ্ট,
কোথাও মোটর ভাপ্‌রা উগারি দাপটে দুনিয়া দলছে!

৪

সাঁওতাল কুলি কোথাও করিছে আয়োজন আল বাঁধবার,
খর্জুর গাছে রজ্জুতে বাঁধা বংশী ও হাঁড়ি রাঁধবার।
কাবুলিরা লাঠি হস্তে
চলেছে চাহে না বসতে,
জননীর কোলে ছোট ছেলে ওই তোড়জোড় করে কাঁদবার।

৫

কোথাও নিকানো মাটির ছাদেতে বধূরা কাটিছে চরকা,
রাঙা পাথরের বুরুজের গায়ে মর্মরে গাঁথা ঝরকা।
রূপসী কৃষক কন্যা
ছুটায় রূপের বন্যা,
কোথাও ঢেকেছে রমণীর রূপ রমণীয় সব বোরখা।

৬

কোথাও চলেছে ওড়না উড়ায়ে পরি শার্ট সায়া সুকতন,
টোপ টুপি আর পাগড়ির সাথে খোলা শির ভ্রমে ভুক্তন।
চলে পল্টন মার্চে
পরমায়ু সব বাড়ছে
কোথাও নাঙ্গা সন্ন্যাসী চলে সবকেশী সব লুপ্তম।

৭

বহুভাষী তুমি কথা কও কভু উর্দু ফারসী বাঙলায়,
হিন্দি পুস্তু সবে ওয়াকিফ্‌ বল কে তোমারে সামলায়,
সুর যে তোমাকে হাতড়ায়,
ঠুংরি কাজরী দাদ্‌রায়
ঘটাও সখ্য খান্দানী শেখ, বাবু, শেঠ, লালা, লাঙলায়।

৮

ধর্ম তোমার বিশ্বজনীন পথে পথে তব মন্দির,
নগরে নগরে কত মসজিদ গির্জা ও প্রতিদ্বন্দ্বীর।
সমাধির সব গম্বুজ
কাল নীরে শ্বেত অম্বুজ
রয়েছে দাঁড়ায়ে, স্বর্গে মর্তে ফন্দি করিছে সন্ধির।

৯

পথ দেখাইয়া পানিপথ দিয়া, ভাঙগড় কত দিল্লি,
কোথাও তোমার বাজিছে সাবও, কোথাও ডাকিছে ঝিল্লী।
কোথাও মিনার উঠছে,
কোথা বীণা তার টুটছে,
কোথাও উগ্র ব্যাঘ্রের বাসা কোথাও আভীরপল্লী।

১০

তুমি নিয়ে যাও দুর্বার সেনা কামান অশ্ব হস্তী,
দেশের ফসল নষ্ট করিয়া ছড়ায়ে মৃতের অস্থি।
লয়ে যাও দিবারাত্রি—
ঝোলা ঝাণ্ডা ও যাত্রী,
সোহাগে কোথাও লোহাকে গলাও দরিয়ায় স্থাপো বস্তি।

১১

বাঙলা হইতে সঙ্গে নিয়েছ গোবর সর্ষে বাবলায়,
সটান চলেছ দৌড়ে কোথায় ধরিয়া কে তায় সামলায়।
বক্ষা সাধু ও শ্রেষ্ঠের
ওটা যে নিয়ম কৃষ্ণের
হরি বাখে যারে মারিবে কি তায় বাঘে, সাপে নাহি খাবলায়।

১২

স্বর্গ না হোক ভূ-স্বরগ যেতে সড়ক বানালে শের শা,
সিধা আগাগোড়া, নয় বাঁকাচোরা, কোনোখানে নয় তেরচা।
ভারতের দুই প্রান্ত
এক করি তবে ক্ষান্ত
গঙ্গার তুমি সঙ্গীই বট, দেখে মনে হয় ঈর্ষা।

১৩

তুমিই মিশালে আমে আখরোটে, আলুবোখারায় চালতায়,
এক পর্দায় ফুটি সর্দায় পুনকো পালং পলতায়।

বাঙালি এবং তুর্কে
দুর্গাবাড়ি ও দুর্গে,
জর্দার সাথে সাঁচিপান আর সুর্মার সাথে আলতায়।

১৪

তুমিই মিশালে শালে মসলিনে হুকা কাছে এল ফরশী।
মিহিদানা কাছে বেদানা বসিল বর্শার কাছে বঁড়শি।
হিঙ্ কলায়ের পার্শ্বে,
চিনে লওয়া আর ভার সে,
ভুট্টা বালাম বাসমতি সব একদম পাড়াপড়শী।

১৫

বিলকুল ভাই তকলিফ নাই হরঘড়ি সব ছুটছে,
কোথা থাকে থাক ময়ূরের ঝাঁক, টিয়া টাকসোনা উড়ছে,
হরিণ উষর ক্ষেত্রে
চাহিছে আকুল নেত্রে,
বাঙালির ছেলে বাংলার লাগি তবু আঁখি মন ঝুরছে।

অমৃত পিয়াসা

পথের ধারে ওই যে অশথ গাছে
এখনো তার নামটি লেখা আছে।
পথিক বালক দাঁড়িয়ে শীতল ছায়ে
রাখলে এঁকে নামটি গাছের গায়ে।
পথের লোকে স্মরবে লেখা দেখে
তাই সে আহা নামটি গেছে রেখে।

২

এ নয় খেলা, আমোদ করে লেখা,
যেথায় সেথায় পাই যে ইহার দেখা
কেউ পিরামিড কেউ বা মিনার গাঁথে,
কেউ বা লেখে তাম্রফলক পাতে।
এক পিপাসা একই আবেগ ভরে
কেউ বা পুতুল কেউ বা মহল গড়ে।

৩

কেউ লেখনী কেউ তুলিকা ধরি
নামটি চাহে রাখতে অমর করি।
তপ করে কেউ এ বর শুধু মাগি,
মথন করে সিন্ধু ইহার লাগি,
ইহার লাগিই যুদ্ধ দেবাসুরে,
ইহার তৃষাই জাগছে ভুবন জুড়ে।

৪

মানব কেন ছাড়বে আমি ভাবি
অমৃতে তার জন্ম হতে দাবী।
সুধার ক্ষুধাই জাগছে যে ওই দাগে,
মন্থনেরি ঢেউটি বুকে লাগে।
আদিম তৃষা মিটবে নরের কিসে
দাবির কথা রক্তে আছে মিশে॥

অশ্রু নিবাস

ওই যে খোকার কাজল-চোখের জল,
বল্ দেখি সে কোথায় থাকে বল্?
রয় সে যেথা নীলোৎপলের ফাঁকে
অমল ধবল মরাল-শাবক ডাকে;
মুক্তাগলা বৃষ্টিধারা যেথা,
পিছলে পড়ে কাঁপায় কমল-পাতা;
যেথায় পরীর ফুৎকারেতে ওই
হেমগিরিতে ছড়ায় জুঁয়ের খই।
কান্না যেথায় আর্দ্র হাসির ঘামে,
ওই যে সরিৎ সেথায় থেকেই নামে।

২

ওই তরুণীর নয়ন কোণায় জল
বল্ দেখি সে কোথায় থাকে বল্?
রয় সে যেথা সদাই কদম ফোটে,
কথায় কথায় ইন্দ্রধনু ওঠে।

রৌদ্র মেঘের ঝগড়া মাটির ঘরে,
খঞ্জন এবং চাতক যেথায় চরে;
নন্দন এবং পঞ্চবটীর হাওয়া
করছে যেথা নিতুই আসা-যাওয়া।
নর্মদা রয় ফুলের ফুলের কুটির ঘেঁসে,
ও জল জোটে সে দেশ থেকেই এসে।

৩

ওই যে বুড়ার তপ্ত নয়নধার,
বল্ দেখি রে কোথায় আবাস তার?
সে রয় যেথা কালাগুরুর গাছে
কৃষ্ণ ভুজগ অসঙ্কোচে নাচে,
তীব্র যাহার দৃষ্টিবিষের শরে
উড়ন্ত ওই কপোত পুড়ে মরে।
বজ্র যেথায় জনম লভে হায়,
কপিল যেথা রোষ নয়নে চায়,
যেথায় ঋষি দুর্বাসারি বাস,
সেথায় থাকে ও ক্ষীণ জলোচ্ছ্বাস।

৪

ওই যে সাধুর পুণ্য নয়নধার,
বল্ দেখি রে কোথায় আবাস তার?
মন্দাকিনীর মন্দানিলের ভরে
কল্পতরুর ফল যেখানে ঝরে,
অস্তরবির ঊর্ধ্বকিরণ লুটে
যেথায় পূজার স্বর্ণকমল ফুটে।
স্বাতীর সলিল জলদ যেথা আনে,
দেবের চরণ ঘামে ধরার টানে,
আঁধার ভেদি কেন্দ্র উষা হাসে
ও নীরটুকু সে দেশ থেকে আসে॥

ভক্তির যুক্তি

শুভ ফাল্গুনে দেখা হল মোর এক কৃষকের সাথে
পুলকে দেখিছে ক্ষেতের ফসল হঁকাটি লইয়া হাতে।
দেখিয়া আমারে নোয়াইয়া মাথা কহিল ঠাকুর শোন—
তুমি পণ্ডিত, আমি তো মূর্খ, জ্ঞান নাই মোর কোন।

পাড়ায় আজিকে তর্ক হয়েছে একটা বিষয় নিয়ে,—
এই দুনিয়ার মালিক যে-জন, পুরুষ বটে কি মেয়ে?
ধর্মরাজের দেয়াসী মহেশ বলিয়াছে জটা নাড়ি
ধরার কর্তা জগদীশ্বর হইতে পারে কি নারী?
আমি তো অবাক! প্রসব করেছে এই যে দুনিয়াখানা
শ্যামা মা আমার, এ-কথা জানে না, সবারি তো আছে জানা।
জগৎ-জননী মা না হত যদি দোপাটি পেত কি ফোঁটা,
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলি তার, কদলী গরদ গোটা?
ময়ূর পেত কি ময়ূরকণ্ঠি, রেশমী পোশাক টিয়া,
ঝুঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি বাঁধা লাল ফিতা দিয়া?
ছেলে মেয়েদের খেতে দিতে পারে, পারে সে সোহাগ দিতে
টিপ্ কাজলেতে সাজাইতে পারে, দেখিনি তো হেন পিতে।
সুমুখেতে দেখ দুষ্টু বোলতা সোনালি ঘুনসি পরা,
বকের কামিজে কিবা ইস্তিরি যায় না ময়লা করা।
ডোবার যে পানা তাহারও পোশাক তাহাতেও ফুল-কাটা,
ওর ও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই ওই যে খেজুর কাঁটা।
ভূতলে গগনে গিরি নদী বনে দেখুক চাহিয়া কেহ
চারিদিক দিয়া গড়ায়ে পড়িছে মায়ের গভীর স্নেহ।
তুমিই, ঠাকুর, কর মীমাংসা, বলিল সে হাসি মুখে,
আমি তার সেই কর্কশ কর টানিয়া নিলাম বুকে॥
বলিলাম জেনো ধর্ম ক্ষেত্র এই সে তোমার মাঠ,
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ।
তুমি ভক্তির গরদ পরেছ, তোমারে প্রণাম কোটি,
পাতা খেয়ে খেয়ে ভোঁতা মুখ মোর এখনো বাঁধছি গুটি।

দাবি

টার্কি কি টাসখান্ড টোকিয়ো কি মস্কো
কেনেডা কি কেন্টাকি যেথা হোক বাস গো।
হোক বেশ হোক দেশ আহারাদি ভিন্ন,
একেবারে মুছে যাক স্বজাতির চিহ্ন,
যে ভাষায় কথা কয়, যেখানেই রয় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।

২

অমৃতের অধিকার জন্মের সঙ্গে
সূর্যের রশ্মি সে বিম্বিত রঙ্গে,
চরণে কি শিরে র'ক হোক সে বিবর্ণ
সনাতন ছাপ মারা সে যে সেই স্বর্ণ।
জন্মের অধিকার জোরে পুন লয় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।

৩

প্রলোভনে ভয়ে যদি ত্যজে নিজ ধর্ম
অনুতাপে পরে যদি বিঁধে তার মর্ম।
অনাচার করি যদি পরে হয় ক্ষুণ্ণ,
পুন ফিরে আসা যদি ভাবে মনে পুণ্য,
করি হরি নাম করে সব পাপ ক্ষয় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।

৪

যে ডোবায় ডুব দিক সে যে রাজহংস
শুভ্রতা কোনমতে হবেনাকো ধ্বংস।
যেই দিকে ছুটে যায় বর্ষার জল গো
গঙ্গার বুকে এলে পূত নির্মল গো।
অভয়ের বাণী স্মরি সব ব্যথা সয় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।

৫

যে বনেই থাক আর যে নামেই ডাকবে,
চন্দন চিরদিন চন্দন থাকবে।
কুর্তা কামিজ কোটে খেদ নাহি বিন্দু
যে বাসেই ঢাকা থাক বুক তার হিন্দু।
ডাক নামে ডাকিলেই শুনি তন্ময় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।

৬

শ্মশানেতে শ্যামা তার গৃহে তার লক্ষ্মী
আপদে বিপদে তার নারায়ণ রক্ষী।
বাণী তাব জিহ্বায় বুকে তার স্বর্গ
প্রাণ কাঁদে ইহাদিকে করিতে যে পর গো।
শিরে তার সরধুনী মৃত্যুঞ্জয় সে,
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।

শেষ দান

নয়নে পড়েছে মৃত্যু-কালিমা দেরি নাই বেশি আর
মোর পানে প্রিয়া তুলিল বারেক করুণ নয়ন তার।
বিদ্যুৎ হানা বিশাল নয়ন কালো টানা সেই ভুরু
নমিয়া পড়েছে চির নিদ্রায় তন্দ্রা হয়েছে শুরু।
অঞ্চলে বাঁধা চাবি রিং তার দিল মোর পদতলে
শুভ দৃষ্টির দুই জোড়া আঁখি ভরিয়া উঠিল জলে।
সে চাবি তাহার বড় আদরের ক্যাশ বাক্সের চাবি
কোনক্রমে মোর চলিত না শুধু তাহার উপরে দাবি।
এ চক পুরীর চাবি মোর প্রিয়া যতনে রাখিত কাছে
চাহিলে কখনো পাই নাই আমি ভাবিতাম কি যে আছে।
আজ দিয়ে গেল শেষ সন্দেশ সকলের শেষ দান
দানের ভঙ্গি দাতার মিনতি ব্যাকুল করিছে প্রাণ।
চলে গেছে প্রিয়া বরষ কেটেছে চোখের বরষা লয়ে,
শূন্য সায়রে ভ্রমর গুমরে পদ্ম পরাগ বয়ে।
বিজন দুপুরে উদাসী পরান হাতে নাই কোনো কাজ
বাক্সটি তার কাছেতে আনিয়া খুলিয়া দেখিনু আজ।
রহিয়াছে সেই আশীর্বাদীর ইয়ারিং এক জোড়া
ঠাক্‌মার দেওয়া প্রাচীন ঝুমকা লাল কৌটায় ভরা।
হার একছড়া গুরু বক্ষের গুমর মাখানো যাতে।
বিয়ের নোলক রূপের ঝলক জড়ানো রয়েছে তাতে।
শাঁখার সোনার পাত একটুকু কটি কাঁচপোকা টিপ।
লাবণীর নভে সাঁজের তারকা সুষমায় হেমদীপ
তারি সাথে আছে চিঠি একতাড়া অনেক দিনের লেখা,
নব অনুরাগ রঞ্জিত লিপি আজ পড়িতেছি একা।
পড়ি আর কাঁদি কত শরতের গত উৎসব স্মরি
ঝরা শেফালির আলিঙ্গনের আমেজ রয়েছে মরি।
ছোট ছোট কথা ছোট দুখ সুখ গাঁথা আছে তার মাঝে
ফুলশয্যার শুষ্ক কুসুমে অতীত সুরভি রাজে।
যৌবন হেথা বাঁধা পড়িয়াছে দেখে মনে হয় ভুল,
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার ঝরনারি কুলকুল।
ক্ষুদ্র ঝিনুক প্রেম-সাগরের খবর দিতেছে ভাই,
চরণ-সিঁদুরে দেবী প্রতিমার কৃপার আভাস পাই
হায় আঙুরের বাক্সে আমার রাখিল কে হীরাচুর
লক্ষ্মীর ঝাঁপি করিল কে মোর বেদনায় ভরপুর।
পূজারিনী যবে খুলে দিয়ে গেল আজি মন্দির দ্বার
আছে ধূপ দীপ, বিল্বপত্র দেবী যে নাহিকো আর।

চিত্রকরের ভুল

তুলিকাতে হাতটি তাহার পাকা রাজার প্রধান চিত্রকরই সেই,
ব্যবসা তাহার প্রতিচ্ছবি আঁকা অন্যদিকে খেয়াল তাহার নেই।
মর্মরেরি ছবির মতো দেহ, মিশেছে তায় রঙের কোমলতা
কেউ বা কবি, পাগল বলে কেহ কেউ বা বলে প্রতিভা তার কোথা?
সমুদ্রেতে চন্দ্রোদয়ের ছবি আঁকতে রাজা দিলেন উপদেশ,
আঁকলে ছবি এমনি আজগুবি নাইকো তাতে সুনীল রঙের লেশ।
অপূর্ব এক মূর্তি কিশোরীর হঠাৎ যেন পেয়ে কাহার দেখা
আঁচলখানি নিচ্ছে টেনে গায়ে অধরেতে জাগছে হাসির রেখা।
চিত্র দেখে উঠল সভায় হাসি শিল্পীরও হায় অশ্রু এল ছেয়ে
সবাই হাসে বিদ্রূপেরি হাসি, তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।

আঁকতে হবে দুর্ভিক্ষেরি ছবি, আজকে রাজার আদেশ হল তাই,
পাগল সে যে নূতন তাহার সবই চিত্রতে কই জন মানব নাই।
বালুর বেলায় কণ্টকেরি গাছে মলিন কোরক কাঁদছে শিশির মাগি,
পুড়ছে দেহ খর রবির আঁচে কাছেই সাগর গর্জে কিসের লাগি।
সভার মাঝে উঠল হাসির রোল শিল্পী চোখে অশ্রু এল ছেয়ে,
সবাই হাসে সবাই করে গোল, তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।

আঁকতে হবে নির্গুণেরি ছবি এবার নূতন উপহাসের পালা,
শিল্পী সে যে প্রেমিক এবং কবিবক্ষে তাহার জাগছে দারুণ জ্বালা।
মাঠের মাঝে একটি পলাশ গাছে ফুল ফুটেছে কাকগুলা দেয় গালি,
বাসন্তী হায় আসি তাহার কাছে সিঁথায় পরেন সাজান বরণডালি।
রাজার সভায় উঠল হাসির ঘটা শিল্পী এবার রইল শুধু চেয়ে,
আজকে হানি চক্ষে নূতন ছটা, তারিফ দিলেন আবার রাজার মেয়ে
শিল্পী বলেন হায় রে আমি ভাবি বুঝলেনাকো কেউ তো আমার কথা,
উপহাস আর নিন্দা কেবল লভি একটা বুকও বুঝলে না এর ব্যথা॥

আজকে আবার নূতন হুকুম হল, দয়ার চিত্র আঁকতে হবে তাকে।
চিত্রকর যে পড়ল বিষম গোলে এবার বড় ভাবতে হল তাকে।
অনেক ভেবে অনেক দিবস পরে যত্ন করে আঁকলে সে হায় কত
শিল্পী আছে চেয়ে চরণ 'পরে মূর্তি দয়ার রাজকুমারীর মতো।
শাবাশ দিলে সভাসদের দলে, রাজকুমারী কিন্তু এবার বাম,
নিজের হাতে লিখে দিলেন তলে দয়া নহে প্রেম যে ইহার নাম।

গোপীযন্ত্র

এসরাজ আমি নই তা জানি, নইকো আমি সারঙ গো।
তবু আমি বাজব খানিক কোরো না কেউ বারণ গো।
অসম্ভব আর আজগুবি যা,
বুঝেও যা যায় না বোঝা,
আমি তারি কারবারী যে, জানিনাকো কারণ গো।

২

আমি ভবের পাগ্‌লা পথিক, দমকা হাওয়া বসন্তর,
উড়িয়ে যাই ফাগের পরাগ, পথ যে আমার স্বতন্তর।
চাই অচেনায় চিনিয়ে দিতে,
আনন্দকে ছিনিয়ে নিতে,
রসিককে হায় রসের মাঝে করতে যে চাই বরণ গো।

৩

ধনী মানীর আদর পেতে করিনাকো প্রাণান্ত,
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ।
দু-দণ্ডেরি আলাপ তো খুব,
বাজিয়ে যাব গাব্‌গুবাগুব,
অকূলের কোন্ কেন্দুবিল্বে করব গিয়ে পারণ গো।

সেই আঁখি

ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে ক্রমে সেই আঁখি তোর সেই আঁখি,
পলক পলক টান্‌ত পুলক আজকে সে হায় দেয় ফাঁকি।
শৈশবে সেই কাজল মাখা
মায়ের স্নেহের চুমায় আঁকা,
চাঁদকে দেখা, চাঁদকে ডাকা, আর কি মনে নাই না কি?

২

এরাই কি সেই চপল আঁখি, সেই বিজলি জলভরা,
প্রেমের দেশের পান্থ পাদপ শিখ্‌লে কোথায় ছল করা
সেই যে শুভ দৃষ্টি করে
আন্‌লে পীযূষ বুকটি ভরে,
কান্না হাসির ইন্দ্রধনু আঁধার মেঘে যায় ঢাকি।

৩

এরাই কি সেই টানত মধু, ফোটার আগে ফুল থেকে,
দূর সাগরের কনক তরী দেখ্‌তে পেত কূল থেকে।
বিনা তারের খপর দিয়ে
নিত চাঁদের পীযূষ পিয়ে
ছায়া ছবির নাচের গৃহ আঁধার হতে নাই বাকি।

৪

এ নয় তো সে তমাল ছায়া, এ নয় তো সে মেঘকরা,
কালিন্দীর এই কালোর লহর ভাসিয়ে নেওয়ার বেগভরা।
ওই ছায়া হায় মায়ার ছলে,
কমলকে হায় মুদতে বলে
সামনে ঝিঙার ফুল ফুটেছে যায় ডুবে যায় ওই চাকি।

বাঁধানো দাঁত

কোথায় গেল সবল ধবল সেই দশন,
কে আজ দখল করলে তাহার সিংহাসন।
রূপটি শুধু রাখলে কে হায় শান দিয়ে,
শক্তি নাহি সজীব করে প্রাণ দিয়ে।
বিধির গড়া রক্ত মাসের মন্দিরে
রাঙঝালে কি জুড়তে এল সন্ধিরে?
রস না পেয়ে রাঙেই কি আর বাঁধবে জোর
গড়া কোকিল বসন্ত কি আনবে তোর?

কনক-কুসুম আটকে দিলে পরগাছে,
আসবে অলি আসবে কি আর তার কাছে?
কোথায় পাবে সেই পরিমল সেই পরাগ
পদ্ম গড়া যায় না দিয়ে পদ্মরাগ।

রামেশ্বরের সেতুর পাথর পড়ল যা
মুক্তা দেহের ঝালর থেকে ঝরল যা।
কোন্ সোহাগার রসান দিয়ে জুড়বি রে
উলট পালট বৃথায় করিস্ উর্বী রে।

আসছে বাদল মানস মরাল জানছে ভাই,
শ্বেতাম্বরার শোভার থাকা ভাঙছে তাই।

ভাঙা বাগান যোগান দিবি কার বলে
মুখোশ লয়ে ঘর করা কি আর চলে?

শিল্পী না হয় গড়তে পারে মর্মরে,
প্রাণ দেওয়া কি কারিগরের কর্ম রে?
কনক সীতার মূর্তি অবিকল দেখি
নির্বাসিতা সীতায় শ্রীরাম ভুলবে কি?

একটি দ্রাক্ষালতার প্রতি

কে বসালে উষর মাঠে এমন আঙুর লতা
দিন দুপুরে জুড়ে দিলে আরব নিশির কথা।
মশানে কে বসিয়ে দিলে নবৎ সুমধুব
মেঘনাদ বধ কাব্যে দিলে কীর্তনেরি সুর।

মুক্তাপ্রসূ শুক্তি এনে ছাড়লে ডোবার জলে
হেমন্তেরি নীহার কেন নিদাঘ চাঁপার গলে।
চমরী গাই গোয়াল ঘরে বইবে কেমন করে
বল্‌গা হরিণ উটের গাড়ির চাপেই যাবে মরে।

জাফ্রান ফুল ফুটিয়ে দেবে শেয়াফুলের গাছে,
আন্‌লে বারি গঙ্গোত্রীর জ্বালামুখীর কাছে।
আতপ চাল আর অর্ক কুসুম দূর্বা ফেলে হায়—
সূর্য অর্ঘ্য রচলে তুমি রজনীগন্ধায়।

যে টেনে লয় প্রেম মদিরা তুহিন কণা চুমি
আনলে তারে আতপ-তাপে কেমন করে তুমি।
চিনতে নারি বিস্ময়ে তাই দেখছি শুধু চেয়ে—
রাজপুতনায় কে আনিল ল্যাপল্যান্ডের মেয়ে॥

প্রাচীন অশ্বত্থ

গুল্ম তৃণের রাজ্যে একাকী উচ্চে তুলিয়া শির,
প্রথম নমিলে প্রভাত সূর্য সপ্ত শতাব্দীর।
ধূসর ভূমিতে এল শ্যামলিমা এল ছায়া সুশীতল
এল ভ্রমরের মধু গুঞ্জন বিহগের কলকল,

প্রথম তোমারে দেখিয়া কেহই পায়নি তখনো টের
তুমিই বহাবে মরুর মাঝারে জোয়ার বসন্তের।
শাখে শাখে হল পাখিদের বাসা তলে বিশ্রাম বেদি
দেশের চক্ষু দেখে বিস্ময়ে আকৃতি অভ্রভেদী।
বরষের পর বরষ করিলে আলো ছায়া লয়ে খেলা
পাপিয়া পিকের কাকলি শুনিলে সন্ধ্যা সকালবেলা।
দুপুরে বাজিত রাখালের বেণু জুটিত পথিক কত
কৃষক শিশুর সোহাগ চলিত নৃত্য অসংযত।
মন্বন্তর কতই সহেছ ভীম ঝঞ্ঝার কোপ
ক্ষুধিত বিদেশী পঙ্গপালের দারুণ উপদ্রব।
নবাবের হাতি ভাঙিয়াছে ডাল তলায় যেপেছে রাত,
হীন কাঠুরিয়া গোপনে করেছে অঙ্গে কুঠারাঘাত।
সাধু সন্ন্যাসী তব পাদমূলে জ্বালায়েছে কত ধুনি
বিশাল ছায়ায় পেলে আশ্রয় ফণির সঙ্গে খুনি।
তব মমতার মুক্তসত্রে অবারিত ছিল দ্বার
বাছিত না হায় শত্রু মিত্র হৃদয় মহাত্মার।
গ্রামের বৃদ্ধ পিতামহদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ
তোমার তলায় শিবিকা নামাল বরণের বধূসহ।
টোডরমলের জরিপী আমিন নিশান গেড়েছে তলে,
নিম্ন শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়াছে নিঠুর বর্গি দলে।
অদূর মেদুর কেঁদুলির হাওয়া বুকে লেগেছিল ঠিক,
শ্রীচৈতন্য বাবা নানকের তুমি সমসাময়িক।
চলে গেছ তুমি ধু-ধু প্রান্তর ধু-ধু করে অনিবার
চারিদিকে ক্ষীণ কাশের শীর্ষ দীনতা বাড়ায় তার।
আছে ঝটিকায় প্রবল স্বনন রোদের তীব্র জ্বালা.
নাহি আর নাহি ধূসর বেলায় তোমার ধর্মশালা।
যাও তরু তুমি তোমার লাগিয়া ঝরে পড়ে আঁখি নীর,
যাও মঙ্গল চামর ছত্র কানন রাজশ্রীর।
যাও তাপিতের দয়াল বন্ধু, সবল সরল প্রাণ,
যাও অতীতের স্তম্ভ অরুণ প্রকৃতির মহাদান।
যাও সুন্দর সাক্ষী সুহৃদ, চির বরেণ্য ধন,
যাও মহাযোগী, যাও আশুতোষ, হে চিত্তরঞ্জন।
তরুর মধ্যে অশ্বত্থ যিনি, বড় যাঁর কেহ নাই,
তাঁরি সাথে তুমি মিশে যাও পুন, তাঁরি বুকে হোক ঠাঁই।

বাউল

বিচিত্র তার আঙরাখাটা দেখে—পথের লোকে অবজ্ঞাতে হাসে,
মাথায় চূড়া লম্বা দাড়ি রেখে, নূপুর পায়ে ভিক্ মাগিতে আসে।
ঘুঙুর গাঁথা একতারাটি নিয়ে, ঘুরপাকে সে ভঙ্গি করে নাচে,
সুরটি তাহার নিজের মতো ক্ষ্যাপা—আপন ভাবে ভোর হয়ে সে আছে।
খেয়াল নাহি অন্য কথা ভাবার, রস ভিয়ানে এতই মাতোয়ারা,
রাগের পথে তাহার আনাগোনা সংসারি সে সকল বাঁধন হারা।
সমাজের যে ধার ধারে না কিছু, কলঙ্ক হার গলায় পরে কিনি,
শুভক্ষণে নষ্টচন্দ্র দেখে সে হয়েছে গৌর কলঙ্কিনী।
রসের নেশায় বুঁদ হয়ে সে ফেরে হয় সে পাগল রাই কানুরই নামে,
সঙ্ দেখায়ে পাথেয় তার করে, কুঞ্জ কেনে প্রেমের ব্রজধামে।
বনের কপোত চরতে আসে গাঁয়ে, নীড় বেঁধেছে শ্যাম তমালে ও যে,
উধাও চকোর সুধার ক্ষুধায় বিভোর জলায় থাকে চাঁদকে নভের খোঁজে।
নয় সে কমল মূর্ত পবিত্রতা, নয়কো জবা রাঙা পায়ের আলোক,
কদম্ব সে রসের কেলি কদম, জঙ্গলের সে জমাট বাঁধা পুলক।
তোমরা তারে করবে কর ঘৃণা, সে যে সকল নিন্দা ঘৃণার অতীত,
সন্ধানী সে পতিত-পাবনেরি তোমরা তারে করবে কর পতিত।

পথের দাবী

দেখিব বলিয়া কথা দিয়া কোথা, না দেখে এসেছি চলে,
দিতে পারি নাই ভুলিয়া গিয়াছি কাহারে কী দিব বলে;
        আজ দুর্যোগে ব্যথা পাই প্রাণে,
        তারা যেন আসি হাত ধরে টানে,
বুঝিতে পারিনে এবার তাদের ফিরাব কিসের ছলে।

২

পথে দেখেছিনু হাঘরে বালক কাঁপিছে দারুণ শীতে,
বলেছিনু তারে বাসায় যাইতে ছিন্ন বসন নিতে।
        সে গেল ফিরিয়া না পেয়ে আমায়,
        আজি তদবধি খুঁজে মরি তায়,
আজি এ বাদলে ম্লান মুখ তার উঁকিঝুঁকি দেয় চিতে।

৩

ধুনি জ্বালিবার কড়ি দিব বলি গিয়াছিনু আমি ভুলি,
রাত্রে সাধুর ক্লেশ হল কত মন করে বলাবলি
আকাশেতে আজ শুনি ডাক তার,
মরমেতে মরি মরম মাঝার,
চোখে আসে জল, ক্ষমা মাগি আমি করিয়া কৃতাঞ্জলি।

৪

রেলে যেতে কবে লয়েছিনু ফল, দিলাম পয়সা ছুঁড়ি
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝারে খুঁজিতে লাগিল বুড়ি.
গাড়ি চলে এল, জানিনে তো আহা
গরিব মালিক পেলে কি না তাহা,
আজ মনে হয় সে রয়েছে চাহি নামায়ে ফলের ঝুড়ি।

৫

দিতে ভুলে গেনু দূর যাত্রীর চেয়ে লওয়া পাখাখানি,
কোথায় পাঠাব জানি না ঠিকানা রেলে জমা দিনু আনি।
আজি সে আসিয়া পাখা চায় যেন
বলে ফিরে তুমি দাও নাই কেন,
বুঝিতে পারিনে সামলাব কিসে এত বড় রাহাজানি।

৬

মন্দির দ্বারে মালা দিতে এলে লই নাই তাহা গলে,
ভিখারি বালকে ফিরায়ে দিয়াছি কোথায় কু-কথা বলে,
কোথা ব্যথা দেখি ঝরে নাই আঁখি,
কোথা কী অর্ঘ্য আসি নাই রাখি,
পূজ্যে কোথায় পূজিতে ভুলেছি ভকতির শতদলে।

৭

দীর্ঘ পথেতে পরিচয় হল যে সব সুহৃদ সনে,
লওয়া হয় নাই খবর তাদের বেদনা জমিছে মনে।
আজ জেগে ওঠে তাহাদের স্মৃতি,
অযাচিত কৃপা, অযাচিত প্রীতি,
হায়, এ বেতার বুকের সেতারে বাজিছে ক্ষণে ক্ষণে।

৮

স্মৃতি সৌরভ বুকেতে ধরিয়া সভয়ে আমি যে ভাবি—
পথ ফুরাইল মিটিল না কই এখনো পথের দাবী।

এদেরি লাগিয়া হয়তো আবার
পেতে হবে ক্লেশ আসা ও যাবার।
কিরাতের দাবী না মিটায়ে ঘরে আনিলাম মৃগনাভি।

কবি লেখে কেমন?

কবি তার কাব্য লেখে বিটপী ফুল ফুটায় যেমন,
ডুবারি সাগর জলে মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন।
জ্যোতির্বিদ যেমন ধারা
হেরে হায় নূতন তারা,
ধীবরে মাছের টানে পুলকে জাল গুটায় যেমন।

২

বরষা যেমন কবে জমায় তাহার মেঘের মেলা,
দীঘি তার কমল হেরে যেমন ধারা হয় উতলা।
পোষা তার পায়রা ঝাঁকে,
বিলাসী যেমন ডাকে,
তৃষিত চকোর ডেকে চাঁদকে তাহার উঠায় যেমন।

৩

মৃতেরে জিয়ায় যেমন উপকথার সোনার কাঠি,
লোহারে পরশ পাথর কনক করে যেমন খাঁটি।
রেশমের কীটগুলি হায়
যেমন ওই তুঁত পাতা খায়,
আপনার পরান দিয়ে সোনার সুতা জুটায় যেমন।

৪

ফাল্গুনী বাঁধলে যেমন শরের জালে ওই পারাবার,
বাঁধে সে সুরের সেতু কাল সাগরের এপার-ওপার।
শবে শিব উঠেন ধীরে
ভস্ম হয় বিভূতিরে,
সাধক তাব আরাধ্যেরি চরণ তলে লুটায় যেমন।

তূণীর
১৯২৮

সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত

কীট বলে, 'আমি যেথা সেথা যাই, গুটি পাকাইয়া মরি,
মানুষের লাগি রেশম তসর গোটা প্রাণ দিয়া গড়ি।
কপাল মন্দ নাহিকো সন্দ কার্য কেবলি বেঁধা,—
পাতা খাই বটে, যেই পাতে খাই সে পাত করিনে ছেঁদা।'

পশু বলে, 'আমি বহি নর-নারী খাটি তাহাদের লাগি,
গায়ের পশম দান করে দিই প্রতিদান নাহি মাগি।
আবার কখনো বাগে পেলে তারে ঘাড় মটকায়ে মারি,
প্রাণ নিই বটে, ধন মান তার লইনে কখনো কাড়ি।'

পাখি বলে, 'আমি গান গেয়ে ফিরি, পিঁজরায় রাখে ধরি,
নির্বোধ নই, যত্ন করিলে পড়াইলে আমি পড়ি।
সুরটা কিন্তু পালটাতে নারি দিক্ না যতই টাকা—
এ সব স্বত্ব সংরক্ষিত মানুষের তরে একা।'

উকিলের মমি*

পাঁকাটির ঠ্যাঙে ইঁদুরের মাথা
চেহারাটি কিসে ডিগমিগে
Brobdignag Dicken-এর দেশে
দেখতে পেলাম এ পিগ্‌মি (Pigmy)-কে
আইনি ব্যাভার গুরু শঠতার
রঙ ঢঙে বল কম কিহে?
খাসা কড়কায় চাষা ভড়কায়
গড় খাই বসে জমকিয়ে।

Mr. Sampson Brass-এর প্রতি। ইনি Dickens-এর Old Curiosity-এর একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ইনি উকিল ছিলেন। তাঁহার বংশ এখনও লোপ পায় নাই।

কাঞ্চন লোভে বঞ্চনা করে
অর্থই ভাবে সার মনে,
কণ্ঠের বাঁকা 'হারমণি' গুণে
হাঁড়িচাঁচা যায় হার মেনে।
পিণ্ডি উদোর ঘাড়েতে বুধোর
চাপানো ভাবে না নিন্দারি,
এক সাথে এ যে সর্প শূকর
বর্গী ঠগী ও পিণ্ডারি।

সোলার সাপ

সুমুখে ওটা কি চমকিয়ে দেখি কামড়াবে নাকি ফোঁস করে,
কি ভীষণ ইস্ এ যে আশীবিষ মুখে পা দিতাম হুস্ করে।
কাছে গিয়ে দেখি আরে ছি ছি একি ফণা গড়া এর অভ্যন্তরে,
সোলা দিয়ে গড়া দেহ রঙ করা ঘাবড়ায় যত বর্বরে।
বাসুকি এ নয় করিয়ো না ভয় ধরে না ধরণী মস্তকে,
রয় না এ হরি বেষ্টন করি নীলকণ্ঠের হস্তকে।
নারায়ণ লাগি রচে না শয্যা লাগে না সাগর মন্থনে,
হউক ভয়াল নাহিকো ক্ষমতা গলে নাগপাশ বন্ধনে।
লখিন্দরের লোহার বাসরে নাহিকো যাবার শক্তি রে,
'মনসা-ভাসানে'-এর গান কেহ গাহিবে না করি ভক্তি রে।
জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞে ইহারে কেহই ডাকবে না,
গরুড় কখনো এ গড়া সাপের ঘরেরও খপর রাখবে না।
নকুল ইহারে করবে না তাড়া শিখী কাছে এর ভিড়বে না,
সাপুড়েও হায় ভেঁপু বাজাইয়া এরে কাঁধে করে ফিরবে না।
ডমরুর রবে নাচে না এ অহি হলাহল নাহি দন্তে রে,
ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িতে হয় না বিষ রোজাদের মন্তরে।
যত পারে আহা ছোঁ মারুক ওটা খেলাক্ উহারে উচ্কিয়ে,
ও ফণা ভাঙিতে চাহিনে মন্ত্র আপনিই যাবে মচ্কিয়ে।

চোর-কাঁটা

কি ল্যাটা তুই চাস্ লাগাতে চোর-কাঁটা মোর বল্ রে,
প্রকাশ করে বল্ আমারে আর ছেড়ে দে ছল রে।
ছুট্‌ছি আমি কাঁটার বনে
তোর ফোটাটাই জাগছে মনে,
রোপণ করা হাতের ফসল নাই গোপনে ফল রে।

২

প্রথম দেখে ভেবেছিলাম কতই পাব সৌরভ
কনকচুরের বোয়ালি তুই হবি মাঠের গৌরব।
নয়তো হবি দাদ খানি রে,
'দুধ-কলমার' আধ খানি রে,
নোস্ শ্যামা ঘাস তোর মূলেতে, বৃথায় সেচা জল রে।

৩

অন্তত তুই দূর্বা হলে পেতাম আশিষ করতে,
'মুতা' হলে পেত না হয় গোধনগুলা চরতে।
এ দুঃখ আর কারে বা কই,
শেষে হলি চোর-কাঁটা তুই,
ভাবতেও হায় আজকে আমার নয়ন ছল্ ছল্ রে।

কিন্তু

জেনো নরের আকার ধরে দৈত্য দানা আছে,
নানান রূপে দুঃখ দিবেই তারা,
মিথ্যা গড়ার যন্ত্র ওরা, হিংসা পিয়েই বাঁচে,
মন যে তাদের সর্ব-বিবেক-হারা।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি,
স্তব্ধ থাকো দেখলে লোহিত আঁখি,
দেবতা মানব যা খুশি তাই পারবে তুমি হতে,
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

ভদ্রবেশী ভণ্ড ডাকাত আগ্‌লে অনেক ঘাঁটি
মিথ্যা প্রচার করবে গলার জোরে,

কাগজ কালির কালীর পাকের লম্ফ পরিপাটি
হয়তো নিতুই চলবে তোমার দোরে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি,
পালাও যদি অন্যে ফেলে রাখি,
দেবতা দানব যা খুশি তাই পারবে তুমি হতে,
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

দৈত্য তাহার দীর্ঘ দশন দন্তে বাহির করে,
ইচ্ছা তোমায় কড়মাড়িয়ে খাবে,
পিশাচ আছে বন্ধুবেশে গোপন ছুরি ধরে,
ভাবছে তোমায় কখন বাগে পাবে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি
পাপের সহিত সন্ধি কর ডাকি,
দেবতা দানব যা খুশি তাই পারবে তুমি হতে,
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

আসবে বিপদ বাঘের মতন, হরির করুণাতে
মেঘের মতো হতেই হবে তাকে,
দুঃখ আছে কষ্ট আছে, দুঃখ কিবা তাতে,
বাইতে গেলেই পড়বে তরী পাকে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি,
আপনারে আপনি দেবে ফাঁকি,
দেবতা দানব যা খুশি তাই পারবে তুমি হতে,
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

যদি

যদি বশে তুমি রেখে দিতে পার চঞ্চল তব চিত্তকে
ন্যাস বলে যদি ভেবে নিতে পার তুমি তব সব বিত্তকে,
সন্তোষে যদি বহে যেতে পার হয়েছে যে ভার অর্পিত,
সম্পদে যদি বহিরন্তরে নাহি হও তুমি গর্বিত,
প্রেমে আপনার করে নিতে পার যদি এ নীরস পৃথ্বীকে,
বিফলতা মাঝে বয়ে নিতে পার যদি চিরাগত সিদ্ধিকে,

সমভাবে যদি সহে যেতে পার তুমি সম্মান লাঞ্ছনা,
বঞ্চিত হয়ে যদি তুমি কভু, অপরে না কর বঞ্চনা,

ভোগে উন্মুখ, ত্যাগে উদ্‌গ্রীব সত্যেতে চিরবিশ্বাসী
ধরণীর রস মধুপের মতো যদি নিতে পার নিঃশেষি,
অভাবেও তুমি ভাবের অলকা গড়ে নিতে পার বক্ষেতে,
সুখের মাঝারে হরির লাগিয়া যদি ধারা বহে চক্ষেতে,

না হয়ে ঘৃণিত ঘৃণা সহ যদি নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে যদি নিজ চোখে দেখ নিজ ক্ষীণ দোষবিন্দুকে,
ছোট করে যদি দেখ তুমি শুধু আপন সুনাম সুখ্যাতি,
আপনার যদি করে নিতে পার অপরের ক্লেশ দুঃখাদি,
মুক্ত গৃহেতে ঘুমাইতে পার যদি বিদ্রোহ-বিগ্রহে,
বিবেকের বুকে জুড়াইতে পার যদি অপমান নিগ্রহে,

অত্যাচারীকে বাধা দিতে পার, পাহাড়ের মতো নির্ভয়ে,
আতুরের তুমি পান্থপাদপ যদি করুণার ক্ষীর বহে,
এক সুরে যদি বেঁধে নিতে পার ভাব ভাষা আর কর্মকে,
ধরা হতে যদি বড় করে তুমি দেখ মনে প্রাণে ধর্মকে:
বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছ ঝরিছে করুণা মস্তকে—
পরশমানিক এসেছে সুমুখে পেতে দিয়ো দুটি হস্তকে।

মাতৃস্তোত্র

মাগো আমার পুণ্যময়ি তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম কৃপা, ধন্য দয়াল মোর বিধাতা।
গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে স্তন্য তোমার টেনেছি গো,
পূর্ণিমা তোর, সুধার আদর চকোর হয়ে জেনেছি গো।
পক্ষিণী মা বুঝতে পারি এই বুকেতে তা দিয়েছ,
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি জনম জনম যা দিয়েছ।
বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলাম,
হরিণশিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছিলাম।
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী তুমি আমার ডাকিনী মা,
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে দুগ্ধ তোমার বাঘিনী মা।
দোল্‌নাতে মা জনম জনম তুমিই আমায় দোল দিয়েছ!
আমি যখন কুসুম-কোরক, লতা হয়ে কোল দিয়েছ।
শবরী মা, আঁচল দিয়ে বুকে আমায় বেঁধেছ গো,
দুখিনী মা, আমায় নিয়ে ভিক্ মাগিয়া কেঁদেছ গো।
আমার লাগি প্রাসাদ রচি আপনি থাকো শ্মশানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি তুমিই ছোটো মশানে মা।
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে টিপ্ দিয়ে যায় বরণ করি,
সাঁজের প্রদীপ লয় মা আমার আলাই-বালাই হরণ করি।
পান্না ঝরে কান্নাতে মোর, মানিক ঝরে হাস্যেতে গো।
লুকোচুরি খেলেন গোপাল কোমল কচি আস্যেতে গো।
জনম জনম মা হয়েছ—জনম জনম হবেও মা,
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার, তোমার কাজল তোমার চুমা।

বন্যা

আমি ভালোবাসি দিগন্তব্যপী বন্যার অভিযান,
গুরু তার কলকল্লোলে পাই অকূলের আহ্বান।
চৌদিকে ওই ছল্‌ছল্‌-করা গৈরিক-গলা জল,
উন্মাদনার একি উৎসব! প্রাণ করে চঞ্চল।
ভাবের বন্যা, প্রেমের বন্যা—উদ্দাম আলোড়ন,
এল ভাসন্ত, ভরা বসন্ত—দুরন্ত যৌবন।
দু-কূল ভাসানো অকূল পাথার উচ্ছ্বাস বহে যায়
যেন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগে প্রতি জল-কণিকায়।

ফণা প্রসারিয়া চলে অনন্ত, ভীম তরঙ্গ নাচে,
গ্রীক সেনা লয়ে দর্পে আলেকজান্ডার ছুটিয়াছে।
এসেছে পাহাড়ি বন্যা, এসেছে বন্যা ভুবন জোড়া,
চলে তৈমুর লঙের বাহিনী ছুটাইয়া লাল ঘোড়া।
শত গৈরিক পতাকা উড়ায়ে ঝঞ্ঝার মতো আসে,
শিবাজীর চতুরঙ্গ বাহিনী ভৈরব উল্লাসে।
ভেসে যায় কত, ডুবে যায় কত, গলে যায় কত কি যে
জলরাজ্যের 'ওয়াটারলু' ও 'জেনা' 'অস্টার লিজে'।

বহিতেছে স্রোত, যুগের যুগের কর্মধারার মতো,
তার সৃষ্টির, তার কৃষ্টির ভঙ্গিমা হেরি কত?
কি প্রচণ্ডতা! মিলেছে কতই শক্তি অলৌকিক—
কতই আর্য, কত অনার্য, গথিক, টিউটনিক।
কত পিরামিড, কতই স্ফিনিক্স, ভাঙে গড়ে বারবার
ক্ষণে উত্থান ক্ষণেই পতন—লক্ষ হরপ্পার।
হয় তো এতেই 'নোয়ার' আর্কের পেতে পারি সন্ধান
বটপত্রেতে ইহারি কোথাও ভেসেছেন ভগবান।

এমনি বন্যা এসেছে লক্ষ ভিক্ষু শ্রমণ সাথে,
কপিলাবস্তু, তক্ষশীলা ও নালন্দা সারনাথে।
এমনি প্লাবন আনিল আবার শঙ্কর জটাজাল
চৌদিকে রচি দুর্জয় মঠ, মন্দির সুবিশাল।
নূতন বন্যা আবার ডুবাল নদীয়া শান্তিপুর,
রাঙাইয়া মন, রাঙাইয়া বন, বহে গেল দূর দূর।
ভালোবাসি জল দেখিয়া আমার উল্লাসে নাচে হিয়া
জগন্নাথের রথের অগ্রে গেরুয়া কীর্তনীয়া।

বন্যা যে আনে মুক্তির স্বাদ—সুদূরের সংবাদ,
নিরঞ্জনের পুণ্যাভিষেক দেখিতে আমার সাধ।
এই তো তরল কুরুক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র মাঝে—
কপিধ্বজের ঘর্ঘর শুনি—পাঞ্চজন্য বাজে।
তন্ময় হয়ে দেখি আর শুনি মনে আমি ঠিক জানি
গোপনে ওখানে কানাকানি হয় গীত ও গীতার বাণী।
ভীম ও কান্ত ও রূপ নেহারি প্রীত, কম্পিত, ভীত
হয় কালিন্দী কুঞ্জের লাগি চিত উৎকণ্ঠিত।

ভৃত্য

প্রভু হইবার নাহিকো আমার শক্তি সামর্থ্য,
যুগ যুগ ধরি পরিচারক, আর আমিই যে ভৃত্য।
'মনু'রে আমিই মানুষ করেছি, সহিয়াছি আবদার,
কোলে করে আমি কান্না ভুলানু সেদিন মান্ধাতার।
'রামভদ্র'-এর হামাগুড়ি দেখে হাসিয়া হয়েছি খুন,
'দাদা, বলে মোর গরব বাড়ালে বালক ভীমার্জুন।
আমি যাই, আসি, শুধু সেবা করি, সদা প্রফুল্ল মন,
আমার সুখের নিকট তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।
উমার বিয়ের টোপর এনেছি—আনিয়াছি চিঁড়া ক্ষীর,
অক্ষয় শাঁখা গড়ায়ে এনেছি বিবাহে সাবিত্রীর।
দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বহিয়াছি শত ভার,
দ্বিরাগমনেতে সঙ্গে গিয়াছি শ্রীবৎস চিন্তার।
পাতিয়া দিয়াছি বেদব্যাসের আমিই অজিনাসন,
জনমান্তর ভাগ্য স্মরিয়া উড়ু উড়ু করে মন।
মনিব ছিলেন কালিদাস মোর, ছিনু তার অনুরাগী,
তুলট কাগজ কিনিয়া এনেছি, 'শকুন্তলা'র লাগি।
কৃষ্ণদাসের পাদুকা বহেছি ধোয়ায়েছি পদ আমি,
মোর হাত হতে হরিতকী লন সনাতন গোস্বামী।
চণ্ডীদাসের লেখা পদাবলী আমি রাখিতাম তুলি,
স্বহস্তে আমি সেলাই করেছি নরোত্তমের ঝুলি।
রামপ্রসাদের বেড়ার বাখারি আমিই এনেছি বহি,
মহামায়া এল কন্যা সাজিয়া দেখিয়াছি দূরে রহি।
ধনী মহাজন রাজা মহারাজ, হিংসা করিনে কারু,
গর্ব আমার বিদ্যাপতির বয়েছি গামছা গাড়ু।

আনন্দে সহি শত লাঞ্ছনা, হয়েও হইনে দেক,
জীবনে হয়েছে শত মহতের পদরজ অভিষেক।
অকিঞ্চনের কি মহাভাগ! বিশ্ব তাহার গেহ
পরশমণির পরশে আমার কাঞ্চন হল দেহ।
গরুড়ের আমি জ্ঞাতি ও দায়াদ, এ যে আনন্দ ভারি
ভৃত্য হয়েই হয়েছি নিত্য অমৃতের অধিকারী।
আমি আসি যাই, শুধু সেবা করি, সদা প্রফুল্ল মন
আমার সুখের নিকট তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।

জুঁই

এক রত্তি জুঁই
গন্ধেতে তোর দেখ্‌ছি—আমি
করলি আকুল তুই।
ক্ষুদ্র বলে কেহই বুঝি করেনি লক্ষ্য,
বক্ষেতে তোর পরিমলের স্বয়ম্বর যজ্ঞ।
গন্ধ একি! মন মাতানো একান্ত অদ্ভুত,
বাষ্পকরা কাদম্বরী অথবা মেঘদূত!
কোন্ সাধনায় পঞ্চভূতে করলি রে তুই বশ?
গন্ধে যে পাই শব্দ এবং স্পর্শ রূপ ও রস।
তোর সুরভি আঁধার আলোয় চেনা চেনা মুখ,
আকাঙ্ক্ষিত চোখের চাওয়া ব্যাকুল করে বুক।
অচেনা অক্ষরে লেখা পড়তে নারে মন,
যুগান্তরের প্রণয় লিপি প্রাণ করে কেমন।
হরির কাছে আগিয়ে যে যাই তোরে যখন ছুঁই
অনুরাগের পথের সাথী আমার রামী তুই।

বর্ধমান স্টেশন

হয়তো তোমরা মোর কথা শুনি হাসিবে উচ্চ হাসি,
বর্ধমানের স্টেশনটি বড্ডই ভালোবাসি।
ভালোবাসি এর ফুলগাছগুলি,—ভালোবাসি এর স্টল,
ভালোবাসি এর সুদূর লাইন—ডিসটান্ট সিগনল।

চেয়ে থাকি আমি, অপলক আঁখি চোখে বহে যায় নীর
এই পথ দিয়ে চলে যায় গাড়ি জম্মু ও কাশ্মীর।
সুখের দিনের সুমধুর স্মৃতি বুকে উঠে উদ্ভাসি
বর্ধমানের স্টেশনটি বড্ডই ভালোবাসি।
সেদিন এমনি শরৎ প্রভাত, স্মরণ হতেছে বেশ,
প্ল্যাটফর্মেতে আসিয়া দাঁড়াল দেরাদুন এক্সপ্রেস।
নামিলেন মোর জনক জননী বহু বর্ষের পর,
দেবতা আসিয়া উজল করিল শূন্য আমার ঘর।
উল্লাসে সব পোঁটলা পুঁটলি নামাইতে যাই ভুলি
শুধু বারবার আমি তাঁহাদের লই চরণের ধূলি।
এনেছেন আহা কতই দ্রব্য—অতরল স্নেহরাশি
বর্ধমানের স্টেশনটি বড্ডই ভালোবাসি।

একটি বেলা যে কাটায়েছি ওই ওভারব্রিজের ছায়,
পঞ্চবটীর বনেই পেয়েছি আমার অযোধ্যায়।
কৈলাস মোর নামিয়া এসেছে রেলের এ প্রাঙ্গণে,
আমার কমলে কামিনী উদয় হেথায় শুভক্ষণে।
ক্ষণিকের এই পূজামণ্ডপ—আজ মনে পড়ে সব,
অনন্ত সেই আনন্দমেলা—বোধনের উৎসব।
এই ঠাঁই মোর মাতৃতীর্থ—এই ঠাঁই মোর কাশী
বর্ধমানের স্টেশনটি—বড্ডই ভালোবাসি।

আজিকে আমি যে আশ্রয়হীন মাতৃপিতৃ হারা
কাতর কণ্ঠে মা বলিয়া ডাকি—আর তো পাইনা সাড়া।
আসে যায় ট্রেন ব্যাকুল নয়নে তেমনি তাকায়ে থাকি,
হয়তো হেরিব সে পুণ্য ছবি—স্নেহ ছল ছল আঁখি।
জ্ঞান তো এখন অনেক বেড়েছে—বেড়েছে বয়ঃক্রম
এখানে এলেই ছেলে হয়ে যাই—করি যে তেমনি ভ্রম।
দেখিয়া হাসেন মাতা পিতা মোর আজিকে স্বর্গবাসী
বর্ধমানের স্টেশনটি—বড্ডই ভালোবাসি।

ফুলঝুম্‌কা

আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ
কটকে ছিলেন নিমক-দেওয়ান চাকুরি কষ্টসহ।
অর্থ প্রচুর, সম্মান বহু কাজেই প্রিয়ার তরে,
মুকুতা দোলানো ঝুম্‌কা গড়ান স্বর্ণকারের ঘরে।
প্রতি মুক্তাটি সুন্দর খাঁটি নিটোল চমৎকার,
দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন নিশ্চয় প্রিয়া তাঁর।
তারপর গেছে সুদীর্ঘকাল, প্রীতির বারতা বহি,
সে ফুলঝুম্‌কা পেলেন ক্রমেতে শেষে মোর মাতামহী।
বহু ঝঞ্ঝাট অভাব গিয়াছে তাহার উপর দিয়া,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছয়টা মেয়ের বিয়া
ঝুম্‌কা তবুও অটুট রয়েছে বন্ধক হতে ফিরি,
স্বর্গবাসিনী আত্মীয়াদেব প্রেম আছে তারে ঘিরি।
যুগের যুগের নবীন বধূর রাঙা ঘোমটার ঘামে,
প্রেমের জ্যোৎস্না, প্রীতির সবিৎ, বক্ষে তাহার নামে।
প্রণয় ব্যবসা করিতে করিতে সে পেয়েছে বুঝি প্রাণ,
অতীত প্রেমেব নির্মাল্য সে কুলদেবতার দান।
ঝুম্‌কা জোড়াটি যৌতুক পেলে পরিশেষে মোর প্রিয়া
শতবাসন্তী ফুলের পরশ আদর সোহাগ নিয়া।
এখন হয়েছে আবার রঙিন কৌটাতে তার ঠাঁই,
স্বর্গবাসীর স্বর্ণ-মরাল তুলনা তাহার নাই।
ফুল ঝুম্‌কায় মোদের প্রণয়ও যাইতেছি যক দিয়া
অংশ লভিয়া হাসিবে মোদের নাতির নাতির প্রিয়া।

কুনুর

আমি চলে যাব হে বন্ধু মোর—দীর্ঘ তোমার স্থিতি।
বরষ বরষ আনিবে বন্যা উদ্দাম কলগীতি।
        এমনি করিয়া ডুবে যাবে কাশবন
        ঘাট মাঠ বাঠ দীন গৃহ অঙ্গন,
খর উচ্ছল ঘন রাঙা জল জাগাবে দারুণ ভীতি।

তোমার দু-কূল হইবে শ্যামল পুন হেমন্ত শীতে।
সজ্জিত হবে-বেগুনী হরিৎ লাল নীল শ্বেত পীতে।

স্বচ্ছ সলিল দ্রব হীরকের ধার
হয়তো দেখিতে পাবোনাকো আমি আর
পারের ঘাটেতে যাত্রীর ভিড় যেন উৎসব তিথি।

যুগ যুগ পরে কোনো সুলগনে হয়তো হইবে দেখা।
পথিকের মতো পরিচিত তটে আসিয়া দাঁড়াব একা।
জন্মান্তর সৌহার্দ্যের বাণী—
হয়তো হইবে সমীরণে কানাকানি,
শুধু চেনা চেনা লাগিবে তোমার আধভোলা সুখস্মৃতি।

দিনে শতবার এই যে মিলন এই নেত্রোৎসব,
তোমার জলকে প্রেমাশ্রুর কি দেবেনাকো গৌরব?
নাগেশ্বরেব পরাগের ঝাঁক সম,
ভরা এ বুকের ঝরা অনুরাগ মম,
তোমার জলে কি রেখে যাবেনাকো কিছু ক্ষীণ পরিচিতি!

রহিল তোমার বুকে ভালোবাসা ফুলে ফুলে উল্লাস।
আমার আদর রাখিবে ধরিয়া এই বনফুল বাস।
হেরিবে তোমার পাণ্ডু ও সৈকতে
তব খেয়াঘাটে নির্জন বনপথে,
মোর কবিতায় অটুট পাণ্ডুলিপি পর্যুৎসুক হৃদি।

রোগশয্যায়

রাঙা রবির উদয় দেখে আনন্দে মোর মন মাতে,
ইচ্ছা করে নূতন দেশে নূতন হয়ে জন্মাতে।
পৌষের নিশির শিশির চাপে—
মুমূর্ষু এই কমল কাঁপে
আবার সে হায় হাসতে যে চায় রবির কিরণ সম্পাতে।

পীড়ায় যখন অবশ তনু ফুরায় যখন আনন্দ,
মৃত্যু যে অমৃত বিলায় নয়কো মোটেই তা মন্দ।
রুগ্‌ণ শরীর নয়ন নীরে—
শাবক হতে চায় রে ফিরে
মায়ের আনন সে চায় শুধু চায় না গোটা কানন তো।

ঝঞ্ঝাহত ভগ্নতরু চায় যে যেতে জাফরিতে,
শিথিল ফুলের কোরক হবার আকাঙ্ক্ষা সব পাপড়িতে।
মুক্তা যে আর বারে বারে
তারের বাঁধন সইতে নারে,
সে চায় যেতে শুক্তি কোলে সাগর-তলে ঝাঁপ দিতে।

ভিড়ের মাঝে হারায় যে মুখ পাই খুঁজে আর কই তারে?
মন-মাঝি আর বইতে নারে বলে নে এই বৈঠারে।
তুফানের এই ভাসান ভেলা
সাঙ্গ করে আলোর মেলা—
অন্ধকারে ফিরছে খুঁজে বাঁধা ঘাটের পৈঠা রে।

হেথায় থাকুক ফুলের বাগান সাজানো এই ঘর বাড়ি,
চলুক ফুলের মরশুম এবং নবীনতার দরবারই।
তুই যে প্রাচীন—তুই যে একা
তোর কি হেথায় মানায় থাকা?
নূতন খেলা পাতবি রে চল্ নূতন মায়ার কারবারি।

পূরবীতে ললিত মিশে বাজে যখন ভুল বীণা
বিশ্ব যখন নিঃস্ব লাগে সেথায় থাকা চলবে না।
সাহস হারা দুর্বল ভাই
কোথায় আবার মিলবে রে ঠাঁই?
নূতন দেশে—নূতন ঘরে মায়ের স্নেহের কোল বিনা?

ঝাপসা লাগা সজল আঁখি নূতন কাজল মাগ্ছে রে,
বুভুক্ষিত তপ্ত হিয়ায় স্তন্য তৃষা জাগছে রে।
হতাদরের পরান যে ফের
চাইছে সোহাগ মা মাসিদের,
অনাগতের অমৃত ঢেউ অধর কোণায় লাগছে রে।

মায়ের শেষ চিঠি

চিঠিখানি মায়ের হাতের লেখা
শুক্রবারে পেয়েছিলাম কবে,
গভীর স্নেহ অমৃতের সে রেখা
ভাবি নাই তো শেষ চিঠি যে হবে।

বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে
মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার,
শেষের কাজল জলভরা এই চোখে
এ জনমে মিলবে না তো আর।
পরের কাছে মূল্য ইহার নাই
অমূল্য এ আমিই শুধু জানি,
বাৎসল্যের সাম্রাজ্যের এ—ভাই
মায়ের দেওয়া দানপত্রখানি।
দুধসাগরের মানচিত্র এ গোটা
শেষ আশিসের দূর্বা এবং ধান,
ললাটে শেষ দই হলুদের ফোঁটা
মায়ের লেখা শেষ চিঠি এইখান।

বাবার চিঠি

আর তো ডাকে আসবেনাকো বাবার চিঠিখানি,
চিরতরে পথ চাওয়া তার ফুরিয়ে গেছে জানি।
আঁখরগুলি মুক্তাসম,
মুগ্ধ আঁখি করত মম
প্রাণ জুড়াত সুদূর থেকে আশিস ধারা আনি।

হায় সে চিঠির মূল্য কত বলব আমি কাকে
আনন্দের এক বাজ্য গোটা আসত যেন ডাকে।
উৎসব সে পত্র পেলে—
তুল্য তাহার আর কি মেলে?
মন শুনিত আকাঙ্ক্ষিত কত মধুর বাণী।

সে পত্র যে আশীর্বাদী পারিজাতের পাতা,
কল্পতরুর সে পত্রে আজ নোয়াই আমি মাথা।
দুখের কথা কি আর কব
সুলভ আজি সুদুর্লভ,
সাগর তীরে কাঁদে চকোর অমৃত সন্ধানী।

চাইনে আমি জয়পত্র চাইনেকো তায়দাদ
বাবার চিঠি পেতে আবার হয় যে শুধু সাধ

ছাপ দেওয়া সে পত্রগুলি
কোথায় সে যায় আমায় ভুলি,
আমি পেলেই ধন্য হতাম নাইকো কারো হানি।

শীতের অজয়

সিকতায় লীন শীর্ণ সলিল ধারা
আজ জননীর স্নেহ হতে যেন হারা!
কূলে কূলে তারি গড়া সবুজের ভিড়।
তীরে কাশ তৃণ করে উন্নত শির!
তারি সাড়া নাই, পায় সবাকার সাড়া।

ভুলে গিয়াছে সে উদ্দাম নর্তন,
দু-কূল ভাসানো তুফানের আলোড়ন।
তৃণের মতন তরু ভেসে যায় বেগে,
বেণু নুয়ে পড়ে হিল্লোল তার লেগে
হেলায় ডুবানো গ্রাম প্রান্তর বন।

ভাঙিয়া চুরিয়া উর্বর করি মাটি,
যাত্রা তাহার জয়যাত্রাই খাঁটি
বক্ষে তাহার কত আবর্ত ওঠে,
রবি শশী তারা সঙ্গে তাহার ছোটে
যৌবনের সে প্লাবন গিয়াছে কাটি।

নাহি গর্জন বাচাল হয়েছে মূক
লভিছে আঘাত-না-দিয়া যাওয়ার সুখ।
বালির বাঁধেতে করে তার পথ রোধ
আজি যেন তার নাহি মর্যাদা বোধ,
আছে যেন কার আগমন উৎসুক।

ঘুচেছে তাহার ভারের অহঙ্কার
সমারোহ নাই এ তীর্থ যাত্রার।
জলটুকু ভরা একটি আকাঙ্ক্ষায়,
বাষ্প হইয়া ঊর্ধ্ব উঠিতে চায়,
ধরা চেয়ে তার মেঘ বেশি আপনার।

ক্ষীণ তোয়ে তার এখন করিছে বাস
কোন্ এক মহা মিলনের উল্লাস।
প্রেমাশ্রু যেন হয়েছে তাহার জল
ঢলঢল করে, নাহি আর কলকল
বুকে পায় মহাসাগরের নিঃশ্বাস।

সাঙ্গ তাহার জীবনের হারজিৎ
কত ক্ষতি আর কতই করেছে হিত,
খসিয়াছে তার দম্ভের নির্মোক
ভিক্ষু হয়েছে আজিকে চণ্ডাশোক
কণ্ঠে তাহার নির্বাণ সংগীত।

দিনান্তে

ধপ্ ধপে হায় মরাল-সম যায় রে দিনগুলি,
চক্রবালের অন্তরালে শুভ্র পাল তুলি।
পাখাতে তার জড়িয়ে গেল
কতই শিশির কতই আলো,
পথের ধুলা পদ্ম পরাগ প্রভাত গোধূলি।

যাত্রা কভু ইন্দ্র-ধনুর রঙিন আলোকে
বৃষ্টি ঝড়ের ঝাপটা কভু লাগ্‌ল পালকে।
কত গীত আর গন্ধ নিয়া,
ব্যথা ও আনন্দ পিয়া
কালের ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া উড়্‌ল কৌশলী।

চরে এরা কোথায় গিয়া কোন্ মানস সরে?
দীন যে মোর দিনের লাগি মন কেমন করে।
ইচ্ছা করে শুধাই ডাকি
এ পথে আর আসবে নাকি?
ভালোবাসা আলোর পাখি ভুল কর ভুলি।

বার্ধক্য

দিবসের রূঢ় আলো লয়েছে বিদায়.
স্বর্ণসন্ধ্যা নামিয়াছে শান্ত আঙিনায়,
শতদল ঝরে গেছে, রেখে গেছে তার
পদ্ম চাকি, উপাদান জপ-মালিকার।
দামোদর থামাইয়া প্রচণ্ড নর্তন—
স্বচ্ছ বুকে গগনের হেরিছে স্বপন।
সাঁজে বসি সাজেহান নয়ন সজল
স্মৃতির সমাধি পরে গড়ায় মহল।
সাঙ্গ লেখা 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব',
সিপ্রাতীরে কালিদাস বসিয়া নীরব।
মন্থনের অবসানে কোথা মন তার?
অমৃতের স্মৃতিবক্ষে বহিছে মন্দার।
কুরুক্ষেত্র শেষে রাখি গাণ্ডীব ও তূণ
মহাপ্রস্থানের কথা ভাবিছে অর্জুন।

সোমনাথ

মিটিল না সাধ হয়তো আমায় আবার আসিতে হবে,
সে মুরতি তব না দেখি যে মোর আঁখি উপবাসী রবে।
তব দেউলের প্রতি প্রস্তর ভাঙা,
জানি প্রভু মোর রক্তে হয়েছে রাঙা।
অস্থি আমার পাষাণের চাপে পিষ্ট হয়েছে কবে।

ধূলি হয়ে আমি ঘুরি ঝঞ্ঝায় সেই হাহাকার বয়ে,
আগুলি এ-ভূমি আমিই রয়েছি ভগ্নস্তূপ হয়ে।
মোর আঁখিজল পারাবারে আছে মিশে,
শিলা জর্জর মোর বেদনার বিষে,
আছি বাঞ্ছিত-দরশন লাগি শত লাঞ্ছনা সয়ে।

মনে পড়ে সেই নীলাকাশভেদী মন্দির চূড়াগুলি,
স্বর্গসরণি দেখাইছে যেন বিধাতার অঙ্গুলি।
বিরাট দেউল শোভে ত্রয়োদশ তল,
স্ফটিক-সেখানে আছাড়ে সাগরজল,
তীর্থযাত্রী হেরে বিস্ময়ে ঊর্ধ্বে নেত্র তুলি।

জম্বুনদের সুবর্ণে গড়া দুইশত মণ ভারী—
শৃঙ্খলে ঝোলে ঘৃত-পরিপুর স্বর্ণ দীপের সারি।
চূড়ার উচ্চ হৈমকলসতলে
তারকার মতো সন্ধ্যা হতে যা জ্বলে,
নাবিকেরা সব বন্দি সে আলো সমুদ্রে দেয় পাড়ি।

কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনা গাহে সিদ্ধ-সাধকদল,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত সে-গীত সুমঙ্গল।
কত আগ্রহে, কত আনন্দে তাঁরা
রচেন স্তোত্র হইয়া আত্মহারা,
ধেয়ান মগ্ন কবি সন্ন্যাসী নয়ন প্রেমোজ্জ্বল।

গুহায় গুহায় ক্ষোদিতেছে রূপ গুণী ভাস্করগণ,
করে অনন্ত মূর্তির কত মূর্তি সে অঙ্কন।
কি অপরিমেয় চির লাবণ্য ধারা
রঙে ও রেখায় ধরিয়া রাখিছে তারা,
পটে ও শিলায় আঁকিয়া রাখিছে তাদের অকিঞ্চন।

দেশ দেশ হতে আসে নর্তক নর্তকী শত শত,
নৃত্যে তাদের কত ব্যঞ্জনা ভঙ্গিমা তায় কত।
অঙ্গে অঙ্গে কি প্রয়াস প্রাণপাত
প্রসন্ন হল প্রীত হল সোমনাথ,
সর্ব অঙ্গে পরমানন্দে প্রকাশ করাই ব্রত।

জুড়ি পত্তন দিবানিশি শুধু তাঁরি আরাধনা চলে,
কেহ পূজে গীতে নাটভঙ্গিতে কেহ বা পুষ্পে জলে।
যোজন প্রসারী সে-দেউল-অঙ্গন,
হেরি মহিমার অযুত নিদর্শন
ভক্তি-ক্ষুব্ধ জন সমুদ্র চলে কল-কল্লোলে।

অরুণ-উদয়ে প্রভাত বেলায় কি ভিড় স্নানার্থীর।
তর্পণ করে করপুটে লয়ে ফেনিল সিন্ধুনীর।
লক্ষ কণ্ঠে একের স্তোত্রপাঠ
মহাভারতের মহামানবের হাট,
শিব-শম্ভুর শ্রীচরণে সেই একসাথে নতশির।

পুণ্যে বিশাল ধর্মায়তন তার সে পূজার প্রথা
নব-জাগ্রত স্বাধীন ভারত ভুলেছে কি তার কথা?
মহাতীর্থের অমৃতাস্বাদ আর
পাবে না কি হায় সন্তানগণ তার?
যুগ যুগ পর এ স্বাধীনতার তবে কি সার্থকতা?

ক্ষুদ্র শব্দ-গন্ধ-রূপেরও হয় না কখনো লয়,
যাহা ছিল তাহা আবার হইবে নাহি কোন সংশয়।
সত্য মহৎ সুন্দর যাহা টুটে,
পঙ্ক হইতে পঙ্কজ পুন ফুটে,
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই অনুকূল বায়ু বয়।
হাজার বছর আগেকার সেই শুভদিন ফিরে আসে
অনাগত সুর অনাগত রূপ শ্রবণে-নয়নে ভাসে।
আসে সোমনাথ নাহি আর নাহি দেরি
জ্যোতির্ময়ের জটার ছটা যে হেরি,
শতদল দশ শত বরষের ফুটে উঠে উল্লাসে॥

মেগাস্থিনিসের সোমনাথ দর্শন

(৩০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

দেউল কি? না না, এ বিস্ময়,—
আবির্ভাব সুন্দরেব নরের এ হাতে গড়া নয়।
তুঙ্গ মন্দিরের শ্রেণী মিশিয়াছে আকাশের নীলে।
ভূমারে আনন্দঘন আকার কে পাষাণেতে দিলে।
স্বরগের শিল্পী হেথা রেখে গেছে তার পরিচয়।

চূড়াগুলি সব স্বর্ণময়;
সুবর্ণ পরশ ঊর্ধ্বে 'জেসন' কি করেছে সঞ্চয়,
সংগীত অশ্রুতপূর্ব সুধাস্যন্দী গম্ভীর মহান,
পাষাণ-ভিতরে যেন 'অর্ফিউস' গাহিতেছে গান।
অনন্ত অম্বরে উঠি স্বর্গ মর্ত করে সমন্বয়।

স্নাত ভক্ত পূজারির দল
বিবিধ নৈবেদ্য বহি অবিশ্রান্ত করে চলাচল।
বিনীত বিচিত্র বেশ বর্ণের কি সমারোহ তায়
পুণ্য গন্ধ-পরিবেশে মানুষ সংস্কার ভুলে যায়,
আছেন যে ভগবান মনে আর থাকে না সংশয়।

দেবতা কি করে হেথা বাস?
জানিনাকো দেখে শুধু বুকে জাগে অজানা উল্লাস।
হিন্দুর এ প্রাণকেন্দ্রে পাওয়া যায় জীবনের সাড়া
সুদূর যুগের গন্ধ সুপ্রাচীন সাধনার ধারা
হেথা আমি প্রজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ হেরি অভ্যুদয়।

সুঠাম পেশল দৌবারিক
যেন শত হার্কুলিস দাঁড়ায়ে রয়েছে নির্নিমিষ।
বিরাট তোরণদ্বার সুবিশাল সুন্দর কপাট,
অভ্যন্তরে অফুরন্ত অপার্থিব আনন্দের হাট।
ধ্যানমগ্ন যোগীকুল প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে রয়।

এ যে দেশ জাতির গৌরব,
সাধু, যাত্রী, পর্যটক সবাকার চিত্ত নেত্রোৎসব।
এ মহা বৈরাগ্য ক্ষেত্রে সবিস্ময়ে হয়ে যাই মূক,
ধর্মের অমৃত সত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় আমি আগন্তুক
তবু অবনত শিরে দেবতার গেয়ে যাই জয়।

হুয়েনশাঙ্-এর সোমনাথ দর্শন

(৩০৬ খ্রিস্ট-অব্দ)

এই সেই সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ যারে কয় লোকে
উদ্গীত মহিমা যাঁর পুরাণের শত পুণ্যশ্লোকে।
এ তীর্থ যোজনব্যাপী সুপ্রাচীন অশ্বত্থের মতো,
ভারতের সব রস শান্তরসে করে পরিণত।
এর দরশনই পুণ্য, এ শুধু মন্দির মঠ নয়,
হেথায় প্রস্তরীভূত জাতির আকাঙ্ক্ষা জেগে রয়।

শুদ্ধ অহিংসার ক্ষেত্র, কোথাও আমিষ গন্ধ নাই.
অপরূপ গন্ধ গীতে পুণ্যের পরশ শুধু পাই।
অদ্ভুত দেবতা এর নাহি জানে মান অপমান,
কখনো বা হলাহল কখনো অমৃত করে পান।
এ ঐশ্বর্য ভিখারির? এ সমৃদ্ধি, এই আড়ম্বর
ভালো কি লাগিবে তাঁর, ভোলানাথ যিনি দিগম্বর?

প্রাচীন পবিত্র শান্ত তন্দ্রাবিষ্ট সুন্দর এ দেশ,
দেখিনু অমৃতহ্রদে কি সহস্রদলের উন্মেষ।
উত্থান-পতনে এর ভারতের উত্থান-পতন,
বৈরাগ্যের ক্ষেত্র এ যে ভারতের সর্বস্ব এ ধন।
হেথাকার ধনী, সাধু, বীর সবে ধর্মভাবময়,
আকর্ষিবে বিধর্মীর শ্যেনদৃষ্টি মোর শঙ্কা হয়।

ভাবে না বিমগ্ধ জাতি কখন আসিবে সর্বনাশ,
হয়তো শ্মশান হবে তাহাদের অর্চিত কৈলাস।
তবু নাহি নাহি ভয়ষ সনাতন ধর্মের প্রতীক
পূর্ণতায় যত শক্তি চূর্ণতায় হবে ততোধিক।
রেণুতেই ষড়ৈশ্বর্য, বিন্দুতে অমৃত-পারাবার,
স্ফুলিঙ্গে ব্রহ্মণ্যতেজ নির্বাপণ নাহিকো ইহার।

কি বর্ণনা দিয়ে যাব—আসে মনে দ্বিধা ও সংশয়,
দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় দিব কি ইহার পরিচয়।
এ বিপুল মহিমায় ম্লান হয় রাজ-রাজশ্রীও,
ভক্তের এ প্রাণরাজ্য একেবারে অনির্বচনীয়।
ভারতের মহাদেব হিন্দুত্বের হে রসবিগ্রহ,
সুপ্রাচীন মহাচীন—তার তুমি প্রণিপাত লহ।

আল্‌বেরুনীর সোমনাথ দর্শন

(১০২৪ খ্রিস্ট-অব্দ)

গোটা দেশটাই মন্দির, ওই মন্দির গোটা দেশ,
করা যাবে এরে ধ্বংসি জাতির শক্তিকে নিঃশেষ।
আঘাত নিম্নে, আঘাত উর্ধ্বে, আঘাত ডাইনে বামে,
আঘাত হিন্দুজাতির মর্মে, তার দেবতার নামে।
ধর্মের নয়, অর্থের লাগি এ দেউল লুণ্ঠন
জানিতে দিবে না স্বজাতিকে তার কূট মামুদের মন।

কি বিরাট এই ধর্মায়তন—-দেবের যোগ্য গৃহ!
অদ্ভুত এই স্থাপত্যকলা যুগে যুগে স্মরণীয়।
এ কি সম্পদ, কি ঐশ্বর্য বিচিত্র মনোরম,
এ প্রাচীন জাতি কোনো জাতি চেয়ে সুসভ্য নহে কম।
উগ্রতাহীন উন্মাদনায় গভীর ভক্তি ভরে
দার্শনিকের জাতি এরা তবু পাষাণের পূজা করে।

তারা বলে এই গোটা বিশ্বের সবটুকু ভগবান,
সর্বময়ের শিলার সঙ্গে কেন রবে ব্যবধান।
পাথর যে নয় দেবতা তাহা তো হীন জন্তুও জানে,
পাথরে দেবতা দেখে যারা তারা বহু উন্নত জ্ঞানে।
ভাবভূয়িষ্ঠ মন ইহাদের, বুকে অমৃতের ক্ষুধা,
পাষাণ নিঙাড়ি ভক্ত চকোর বাহির করিবে সুধা।

এই মন্দির ভগ্ন করিয়া ফলিবে না কোন ফল,
ভগ্ন চূর্ণ হইয়া জাতির অধিক বাড়াবে বল।
আনিবে স্তব্ধ আগ্নেয়গিরি হেন অনলোৎপাত,
বিধর্মীদের বিজয়চিহ্ন করিবে ভস্মসাৎ।
প্রলয়-প্লাবনে ধুয়ে মুছে যাবে জয়ের আবর্জনা,
ফুরাইয়া যাবে আবু হোসেনের নবাবির দিন গোনা।।

আমাদের ভারত

অভ্রভেদী তুষারকিরীট বিশাল হিমালয়;
আপন করা তাকে বড় সহজ কথা নয়।
দুর্নিরীক্ষ্য অদ্রি বিরাট, নাগাল পাওয়া ভার;
অন্ত না পাই তাহার রূপের তাহার মহিমার।
আমরা তো সেই হিমগিরির হেরি রাজশ্রী—
পার্বতী যার কন্যা এবং মেনকা যার স্ত্রী।

সিংহ নরসিংহ তাহার মূর্তি ভয়াল অতি।
ভালোবাসি আমরা তাহার থাবার গজমোতি।
সাপের মাথায় মানিক খুঁজি, দৃষ্টি মোদের তথা;
তুচ্ছ করি বিষের দহন, বক্র ভীষণতা।
হাঙর-তিমির লবণজলের সাগরে নাই সখ,
মুক্তা যে দেয় সেই সাগরের আমরা উপাসক।

এই ভারতে করেনি ভাগ মোঘল কি ইংরাজ;
একদিকে তার কামাখ্যা, আর একদিকে হিংলাজ।
নিজের জাতির কৃষ্টি রেখে গেছে উৎপীড়ক,—
নিভেছে আগ্নেয়গিরি উদ্গারি হীরক।
শ্যামের ভারত শ্যামার ভারত অসি-বাঁশির দেশ;
মধুময় তার চরণরজ, মধুর পরিবেশ।

ভরা কোটি জ্যোতিষ্কেতে মহান নীলাকাশ,
মোদের আকাশ সেই যেখানে ধ্রুব তারার বাস।
মোদের আকাশ স্বচ্ছ সুনীল দিব্য নীলাম্বর,
রাকা চাঁদের সুধার সায়র, রামধনুকের ঘর।
কোথায় মোরা ক্ষুদ্র অনু, কোথায় মহাকাশ।
আমরা ঘটে-পটেই দেখি তাহার যে বিকাশ।

মোদের শ্যামা চামুণ্ডা নন, তিনি তো নন ভীমা,
অন্নপূর্ণা তিনি যে, তাঁর স্নেহের নাহি সীমা।

করেননাকো কেবল তিনি দৈত্য দলনই,
'কমলে কামিনী' তিনি গণেশ জননী।
দশ হাতে দশ প্রহরণের রাখব খবর কী,
আমরা দেখি কেবল মায়ের হাতের ঝিনুকই।

নন তো মহাদণ্ডধারী মোদের ভগবান,
অজেয় অগম্য তিনি শুনেই কাঁপে প্রাণ।
আমরা করি ভক্তি ভরে তাঁহার আরতি,
নন তো তিনি কংসারি কি পার্থ-সারথি।
মোদের ঠাকুর দয়াল ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর তিনি—
বাঁশি বাজান, পায়ে বাজে নূপুর রিনিঝিনি।

ভারত মহিমা

ধন্য আমরা পুণ্যবিশাল ভারতের সন্তান,
শত দৈন্যেরও মাঝে মানি মোরা পরম ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তির লাগি মোরা করি তর্পণ,
করি যে সর্ব কর্মের ফল নারায়ণে অর্পণ।
মধু রাত্রিন্দিব—
গোটা ভারতের আরতি করিয়া জ্বালি মোরা গৃহদীপ।

২

অপবিত্র তো হবে না এ মাটি শুদ্ধ ও সিদ্ধ,
ভক্তের পদ-পরশে নিত্য সে অপাপবিদ্ধ।
এখানে বৃথাই অপ-শক্তির দম্ভ-সৌধ গাঁথা,
চূর্ণ হইয়া ধুলায় মিশিবে বাসুকি নাড়িলে মাথা।
নাহি কোন ভয় নাহি,
জ্বালামুখী শিখা সর্বারিষ্ট সর্বদর্প-দাহী।

৩

মন্দির ভাঙি উপলখণ্ড যাহারা গিয়াছে লয়ে,
সে-দেশ সে-জাতি রহিবে না পর, যাবে আপনার হয়ে।
শ্রদ্ধা তাদের থাক বা না থাক, না থাকুক নিষ্ঠা,
অজ্ঞাতে তারা করেছে সেখানে শিবের প্রতিষ্ঠা।
অনেক কষ্ট সহি
বৃথাই তাহারা পাষাণের ভার লয়ে যায় নাই বহি।

৪

ভারতের ধনরত্ন লইয়া যাহারা করিছে ফেরি,
ক্ষতি কিছু নাই, বিনিময়ে তারা হয়েছে আমাদেরি।
সপ্ত-নদীর বন্যার জল প্রবেশ যেখানে লভে,
এই ভারতের ভাণ্ডার চির-প্রসারিত সেথা হবে।
ওই বাজে জয়ভেরী—
হরণ করেছে বরণ করিতে করিবে না বেশি দেরি।

৫

আনন্দ মোর কতই নিবিড়, কি বিপুল হর্ষ!
আমি ও আমার প্রতি অণুটুকু এ ভারতবর্ষ।
আমি গয়া কাশী, আমি অযোধ্যা, পুরী ও বৃন্দাবন,
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর, সোমনাথ পত্তন।
আমি তো ক্ষুদ্র অতি
কিন্তু বিরাট ওই হিমাদ্রি আমার গোত্রপতি।

৬

ভারত-তনয় অমৃত-পুত্র আমি মৃত্যুঞ্জয়,
পুণ্য বাহিনী গঙ্গা আমাকে আদরে অঙ্গে লয়।
হোক ইউরোপ হোক আফ্রিকা হোক না সে আমেরিকা,
আমার চিতার অগ্নি যেখানে সেখানেই হোমশিখা।
যেখানে রবে সে ছাই,
চিরদিন তরে ভারতবর্ষ হয়ে যাবে সেই ঠাঁই।

ভারতের দাস-পর্ব

ভারতের দাস-পর্ব পড়িতে বেদনা যে পাই ভারি,
এ যেন দীর্ঘ হত্যাশালার মাঝ দিয়া পায়চারি।
কে কেমন কি কি ধ্বংস করিল, লুণ্ঠিয়া হল বীর,
কি হবে মাপিয়া লাজ লাঞ্ছনা অষ্ট শতাব্দীর?
কি হবে গণিয়া সজ্জিত সব দস্যুদলের সারি?
ঘোড়া ও হাতির নাচ দেখাইল, ঘুরাইল যারা গদা,
নারী হরণের বীরত্ব লয়ে গর্ব করিল সদা,—
কি দিয়াছে তারা? দেশ ও জাতিকে করিয়াছে শুধু নিচু
উই-ইঁদুরের ঢ়েটে-গর্বের শুনিবার নাই কিছু।

ও হানা বাড়িতে পেচক ডাকুক, উঠুক গোয়ালিলতা।
সে বিভীষিকার কুশ্রী চিত্র রত কেন অঙ্কনে
ক্ষয়ে যা গিয়াছে কাল-সাগরের তীব্র রসাঞ্জনে?
কি হইবে রেখে শতাব্দী-চাপে পিষ্ট নষ্ট পাঁজি,
ভগ্ন মগ্ন ডাকাতি ছিপের অর্ধদগ্ধ কাছি?
মৃত কুমীরের জীর্ণ দন্ত গাঁথিয়ো না আভরণে।
কেটে ফেলে দাও, ছেঁটে ফেলে দাও, রাখ যা সাচ্চা খাঁটি,
ফোসিল হাঙর কচ্ছপ নয়, মুক্তা যা পরিপাটি।
মহা-সাগরের রত্নাকরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান,
কাল-তরঙ্গ শুধু বারবার বাড়ালে যাহার মান,
যুগে যুগে যাহা দিবে আশা আলো দিবে আনন্দ বাঁটি।
কৃতঘ্নতা ও নৃশংসতার রঞ্জিত বিবরণ
কলঙ্কিত ও দূষিত করেছে যুগের তারিখ সন।
তাদের উপর নাইকো শ্রদ্ধা নাই মমতার লেশ,
শপ্ত সপ্ত-শতাব্দী কর সাতটা ছত্রে শেষ,
তাই কহ যাতে সুদূরাকাঙ্ক্ষী বলিষ্ঠ হয় মন।
যাহা ঘটে তাই ইতিহাস নয়, কতটুকু তার রহে?
অনন্ত এই কালসমুদ্রে সদা তরঙ্গ বহে,
চিহ্ন রাখে না, ভাসাইয়া দেয় আবর্জনার ভার;
দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে চলে তার কারবার,
কাঙ্ক্ষিত তরী বন্দরে আনে—অমৃতের কথা কহে।
তাই কহ যাহা দেশকে জাগায়, আনে দিব্যোন্মাদ,
শিশু গরুড়ের কানে এনে দেয় গোলকের সংবাদ।
আনে তপস্বী ভগীরথ কানে গঙ্গার কলগান,
ধরে দধীচির মনশ্চক্ষে জগতের কল্যাণ,
বিন্ধ্যের বুকে জাগায় আবার সূর্য-ঢাকার সাধ।

বাঙালি

আমরা বাঙালি হয়তো বা বটি দূষী,
মোদের নিন্দা করে যার যত খুশি।
'মেকলে' করিয়া বিষের কুম্ভ খালি
সাধ মিটাইয়া আমাদের দিল গালি।
'কার্জন' হতে মার্কিনী 'মিস মেয়ো'
গালাগালি দিতে কসুর করেনি কেহ।

ডাকুক মশক, লাগুক যতই মাছি—
যেমন ছিলাম, তেমনি আমরা আছি।

কটা সেনা নিয়ে খিলজি বক্তিয়ার
শুনেছি এদেশ করেছিল অধিকার।
'ক্লাইভ' কয়টা ফাঁকা গোলাগুলি ছাড়ি
হেলায় নবাবী মসনদ নিল কাড়ি।
নবাবে বধিতে অবাধ করিতে গদী
সবেগে হাজির হইল মহম্মদী।
মির্জাফরের উঠিল নামিল দর,
ছিয়াত্তরের এল মন্বন্তর।

শিবাজী শাসনে বাঙালি হইয়া দেক
ইংরেজ রাজে করে নিল অভিষেক।
ভারত-বিজয় করিতে হল না দেরি,
বাঙালি বাজাল বৃটিশের জয়ভেরী।
পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দান,
লয়েছে বাঙালি আগে হয়ে আগুয়ান।
বাঙালি মনীষা অপ্রতিহত গতি—
সতত সেধেছে ভারতের উন্নতি।

ইংরেজ যবে ত্যজিল ন্যায়ের পথ,
নিরপেক্ষতা লুকাল স্বপ্নবৎ।
দিল সত্য ও যুক্তিকে উপহাসি
কুবিচারে যবে নন্দকুমারে ফাঁসি,
স্বেচ্ছাচারের সাথে যবে নিপীড়ন
রাজলক্ষ্মীরে করিল আলিঙ্গন,
জানাল বাঙালি স্পষ্ট সত্য ভাষে—
ঘুণ লাগিয়াছে তোমাদের কাঁচা বাঁশে।

এল দুর্দিন, এল সন্ত্রাসবাদ,
বিকটদণ্ড, উদ্ভট অপরাধ।
যুধিষ্ঠিরের উষ্ণ শোণিতবৎ
বাঙালি রক্তে রঞ্জিল এ ভারত।
বাঙালি তরুণ ঝাঁকে ঝাঁকে দিল প্রাণ,
আকাশ বাতাস মাতানো তাদের গান।
বাঙালি দেখিল অজল-উজল আঁখি—
তিমিরে ডুবিছে ব্রিটিশের রাঙা চাকি।

নামিল বাঙালি কল্পনালোক থেকে,
জ্যোতির্ময়ের আলোক-আবীর মেখে।
দুর্দমনীয়, মানে না সে আর মানা—
হানাদার ঘরে দেবেই দেবে সে হানা।
যাহারা হেরেছে, করেছে অত্যাচার,
প্রায়শ্চিত্ত হল আরব্ধ তার।
যে যেথায় আছে কীচক দুঃশাসন,
এল তাহাদের শোণিতের তর্পণ।

বাঙালি কপিল সগরবংশ দহি
সুন্দর করে গড়িতে চাহে এ মহী।
সাগর তাহারি, গঙ্গা-সাগর তারি
পরশুরামের তীক্ষ্ণপরশুধারী।
তার করতোয়া, তাহার চন্দ্রনাথ,
হয়েছে তাহার কামাখ্যা সাক্ষাৎ,
ভগীরথ তারে দিয়াছেন তপোবল,
নব গঙ্গারে টানিছে সে অবিরল।

বাঙালি দিয়েছে ভারতকে সেবা কবি,
বাঙালি দিয়েছে ভারতকে সেরা ছবি।
বাঙালি দিয়াছে দরদী বৈজ্ঞানিক,
বীরসন্ন্যাসী বাগ্মী অলৌকিক।
দেছে অনশনে দৃঢ়পণে তনুত্যাগী
দেশবন্ধু ও জেতা নেতা অনুরাগী।
বাঙালি ঘটাল অঘটন দুনিয়ায়,
অদল-বদল পূজারি ও দেবতায়।

সোনার বাঙলা ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে,
বেড়েছে বাঙালি সতীর স্তন্য পিয়ে।
শবসাধনায় করেছে সিদ্ধিলাভ,
হেরেছে 'কমলে কামিনী' আবির্ভাব।
বাঙালি প্রেমিক রসের ব্যবসা করে
গৌর করেছে সে-ই শ্যামসুন্দরে।
তাহার জ্ঞানের কজন নাগাল পাবে,
কাঁদিয়া আকুল পুরুষ-প্রকৃতি ভাবে।

পৃথক ধাতুতে গঠিত এদের হিয়া,
বজ্র এবং ব্রজের নবনী দিয়া।

বিজয়ায় এরা কাঁদিয়া ফুলায় আঁখি,
করুণা-কোমল হেন জাতি আছে নাকি?
জগৎকে এরা আপন করিতে চায়,
মুখের অন্ন পরকে বিলায়ে খায়।
করিবে বাঙালি ভুবন কান্তিমৎ
শুচি-সুন্দর শুদ্ধ শান্ত সৎ।

'অ্যাটম বম' কি লয়ে 'কসমিকরে'
সৃষ্টির নাশ করিতে আসেনি সে।
দেশকালজয়ী তাহার আবিষ্কার,
ঘুচাইয়া দিবে বিশ্বের জরাভার।
বাঙালির ভাষা মুগ্ধ করিবে ধরা,
জীবনীশক্তিভরা তা মধুক্ষরা।
সুসভ্যতর হইবে জগৎ যবে
বাঙলা ভাষায় মন্ত্র রচিত হবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গার এই দেশ
নব চেতনার করিয়াছে উন্মেষ।
বাঙালি জাতিই বাঁচাইবে এ ভুবন,
রণমুখী নয়, হরিমুখী করি মন।
সুধাসত্রের সেই অধিকারী ভাবী,
সারা ধরণীর গুরুপদে তার দাবী।
ভালে দাও তার প্রথম হোমের টিকা,
গালে উষ্ণতা, সন্ধ্যাদীপের শিখা॥

স্থপতি

দীপ নাম তার, ভাস্কর তারা, বহুদিন হেথা বাস,
গৌরবময় বংশের ইতিহাস।
পাঠশালে মোর সহপাঠী ছিল, মেধাবীও ছিল বটে,
আজ ভিক্ষুক, কপালে যা থাকে ঘটে।
ভাবিনু এবার তীর্থ ভ্রমণে যাইব একটু দূর
সমুদ্রতটে পুরী জগবন্ধুর।
দীপ আসি মোরে আগ্রহে বলে, "সঙ্গে যাইব আমি,
টেনেছেন মোরে পুরীর জগৎ স্বামী।"

মাসেক কাটানু পুরীধামে, পেয়ে তৃপ্তি দেহে ও মনে
জগন্নাথ আর জলনিধি দর্শনে।
দীপ খায়-দায় ঝিমায় ঘুমায়, রহে সে আপন মনে
বেড়াতে গেলাম কোণারকে দুইজনে।
বিশাল সূর্য-মন্দির যেই চক্ষে পড়িল তার।
নূতন মানুষ—সে দীপ নহে সে আর।
উল্লাসে তুলি অঙ্গুলি তার দেখাল দেউল মোরে
সুন্দর এক সূর্যোদয়ের ভোরে।
হেরি সুগঠিত পাষাণ প্রতিমা, আগে চোখে পড়ে যেটি,
দীপ বলে, "আজো দাঁড়িয়ে আছিস বেটি!"
সব যেন চেনা, চলেছে ক্ষিপ্র দীপ্ত পদক্ষেপে
জাগে যৌবন সর্বশরীর ব্যেপে।
প্রতি প্রস্তর প্রতিটি মূর্তি নেহারে বারংবার,
ওরা জীবনের শিলালিপি যেন তার।
পাষাণপুষ্প গন্ধ বিতরে, ছবি যেন হাসি নমে
যুগান্তরের সুহৃদের সমাগমে।
সম্ভ্রমে তারে ডাকিয়া বলিনু, "ফিরিতে হবে যে ত্বরা!"
দীপের চক্ষু এখনো স্বপ্নভরা।
কহিল—"বন্ধু, অপেক্ষা কর, দেখ হয়ে সুস্থির
আমার হস্তে গড়া এই মন্দির।
আমি করিয়াছি পাষাণের এই সূর্য-অর্ঘ্যদান,
কালের পরশ করিতে নারিবে ম্লান।
গড়িয়া দেউল লভেছিনু আমি সবিতার কাছে বর
এখানে এলেই হইব জাতিস্মর।
হেরিয়া দেউল ফিরিয়া পেলাম পুরানো মমতা প্রীতি,
মানসে জাগিছে জন্মান্তর-স্মৃতি
অর্কপুষ্প, বনঝাউ. যেথা দুলিতেছে সমীরণে
প্রথম দাঁড়ানু ওখানে রয়েছে মনে।
রাজার নিদেশে প্রথম পাথর স্থাপিনু যখন আসি,
খণ্ডচন্দ্রে হেরিনু পৌর্ণমাসী।
সে কি আনন্দ, সে কি উচ্ছ্বাস, আমোদিত ভূর্ভুব,
চৌদিকে ধ্বনি, 'আরম্ভ হোক শুভ'।
বিপুল জনতা, ধ্বজা ও পতাকা বাদ্য শঙ্খরব—
মনে পড়ে সেই যজ্ঞ-মহোৎসব।
গায়ত্রীকে যে আমি দেখিয়াছি হইতে মূর্তিমতী,
সৃষ্টি আমার হইয়াছে শাশ্বতী।

এই বিটঙ্কে কপোত-কপোতী দুজনে থাকিত বেশ,
মন্দির গড়া তখনো হয়নি শেষ।
কর্ণিক দিয়া পাষাণে পাষাণে এইখানে দিনু জোড়,
দেখিনু নৃপতি পার্শ্বে দাঁড়ায়ে মোর।
বিদায়ের দিনে ওই দেহলীতে রাখিনু যন্ত্রপাতি
উত্তরায়ণে শেষ প্রস্তর গাঁথি।"
আমি নির্বাক, বিমুগ্ধ মোরে করিয়াছে যাদুকর।
যা দেখায়, দেখি—অনিন্দ্য সুন্দর।
দীপ তেজোময় সর্ব অঙ্গে জ্যোতি কি অপার্থিব,
কথায় আমি কি বর্ণনা তার দিব?
হেরিনু তাহার সত্যমূর্তি শুনিনু সত্যভাষ,
জন্মান্তর করি আমি বিশ্বাস।
আমার সঙ্গে দীপ গিয়াছিল বলিয়া ফেলেছি ভ্রমে,
দীন গিয়াছিল রাজেন্দ্র-সঙ্গমে॥

নমস্কার

দেশের লাগিয়া যারা দলে দলে হেলায় দিয়াছে প্রাণ,
কঠিন কারার কক্ষে যাদের হল দিবা অবসান,
যাদের শোণিতে রঞ্জিত হল মেঘনা গঙ্গা রাবী,
বিধাতার কাছে সব আগে হল পেশ যাহাদের দাবী,
বড় বড় প্রাণ ডারি দিয়া যারা, বড় করিয়াছে দেশ,
অসীম যাদের সাহস এবং অশেষ যাদের ক্লেশ—
তাদের বারংবার
আজি শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

২

যুগের যুগের যেই কবিদল শিঙা বীণা বাঁশরিতে
পরাধীনতার যাতনা জাগালে—উন্মাদনার গীতে।
সবাই স্বাধীন এ বিপুলভবে ভারতই ঘুমায়ে রবে?
ঠাঁই কি পাবে না সে স্বাধীনতার সুধার মহোৎসবে?
আট-শতাব্দী-ব্যাপী স্বজাতির হীনতার অপবাদ
হৃদয়-রক্তে ধুয়ে দিতে যারা করিল ডঙ্কানাদ—
তাদের বারংবার
আজ শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৩

সুদূরদর্শী মনীষী যে সব দিব্যদৃষ্টিমান,
ধ্যানে নেহারিয়া দেশের এ-রূপ গাহি বন্দনা গান,
ভবিষ্যতের এ মহিমময় দিনের পাইল টের,
রসনা যাদের আস্বাদ পেল অনাগত অমৃতের,
ব্যথিত করিল যাদের হৃদয় পরাধীনতার গ্লানি,
শব-সাধনায় জাতিরে জাগালো দিয়া অভয়ের বাণী—
তাদের বারংবার
আজি শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৪

কটিবাস-পরা যে-মহামানব নীরব তপস্যায়
এ-দেশ জাতির মুক্তি আনিল কেবল অহিংসায়,
কোনো দেশে কোনো যুগে যাহা হয়নি অনুষ্ঠিত
সেই অসাধ্য সাধন করিয়া,—ধরা হল বিস্মিত।
মনুষ্যত্বে হল বড়, যারা বড় ছিল পশু বলে,
সিংহ তাহার কেশর লুটাল সাধুর চরণ-তলে—
তাঁহাকে বারংবার
আজ শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৫

এস স্বাধীনতা চিরকাঙ্ক্ষিত, ছিলে হয়ে তুমি পর,
চেয়ে আশাপথ ছিল এ-ভারত সহস্র বৎসর।
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর তুমি পুন ইহার মৃত্তিকায়,
মহাভারতের গৌরবময় যুগ যেন ফিরে পায়।
হোক খণ্ডিত—অখণ্ড হতে হবে না অধিক দেরি,
বাজিয়া উঠুক শঙ্খ ঘণ্টা সঘনে বাজুক ভেরী।
চরণে বারংবার
গোটা এ-ভারত আজি শুভদিনে করিছে নমস্কার।

ভৃগুমুনি

কৃষ্ণের বুকে পদাঘাত করি,
চলে ভৃগুমুনি বনপথ ধরি,
কিন্তু মুনির মনটা বড় বিষণ্ণ।

কহে চার্বাক পথে হয়ে সাথী,
শক্তিমানকে মারিয়াছ লাথি
গৌরব সে তো, বেদনা মনে কি জন্য?
সবে ভয়ে করে যাহারে প্রণাম
জানাইয়া দিলে তাকে তার দাম,
জগতের ভয় ভাঙালে, এতে কি দুঃখ?
ভৃগু কন, শোনঅ মূঢ় তোরে কই
করিয়া আঘাত দুঃখিত নই,
তাঁর ক্ষমা মোরে ব্যাকুল করেছে, মূর্খ!
শুনি তাঁর বুকে পদ ঠেকাইলে
অনন্ত কাল নরক যে মিলে,
তাই গিয়াছিনু তাঁরে পরীক্ষা করতে।
সর্বশক্তিমানের বিনয়
দেখিনু তাহাতে টলিবার নয়,
অনন্তকাল হবে মোরে কেঁদে মরতে।
নরক-যাতনা ছিল যে রে ভালো,
ক্ষমায় আমার বুক জ্বলে গেল,
আঘাত করিয়া কি আঘাত পেনু বক্ষে।
ষড়ৈশ্বর্যে নাই অভিমান
অধমে করে সে মর্যাদা দান,
অনুতাপ-বারি রুধিতে পারি না চক্ষে।
তাঁরে পদাঘাত করা খুব সোজা,
শক্ত তাঁহার মহিমাটি বোঝা—
করুণার তাঁর নাহি রে নাহি রে অন্ত।
যিনি জগদীশ বিশ্বম্ভর
সব পদ পড়ে তাঁহার উপর,
তাঁর পদ পায়—সে বড় ভাগ্যবন্ত।

কঃ পন্থা

সভ্যতার সে রোমীয় গতির হয়নি ব্যতিক্রম,
'কেপুয়া' হইতে আমরা চলেছি রোম।
সভ্যতার আজ রন্ধ্রে শনিগ্রহ,
চারিদিকে শুধু ক্রীতদাস-বিদ্রোহ
সারি সারি শব ঝুলিতেছে ক্রুশে, এ নহে স্বপ্ন

২

কেপুয়া কোরিয়া কোজো কেনিয়ায় বিশেষ প্রভেদ নাই,
কাজ করিতেছে একই সে সভ্যতাই।
বাড়িছে শত্রু—যতই হতেছে নাশ
নব নব রূপে আসিছে 'স্পার্টাকাস'
এ-পথে কেবল পচা কৃষ্টির আমিষ গন্ধ পাই।

৩

আনন্দ পায় জাতি নিপীড়নে ভয়াল নির্যাতনে,
সুরুচি শরম গিয়াছে নির্বাসনে।
দেখি মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটারের দল
হাসিছে জনতা উল্লাসে চঞ্চল,
যাহা নির্মম, রোমাঞ্চকর, তাই দেখে তাই শোনে।

৪

শুচি ও সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে আসিয়াছে অবসাদ,
এল জঘন্য কদর্যতায় সাধ।
সংঘাতে, প্রতিহিংসা লোকক্ষয়ে
জাতির স্ফূর্তি তৃপ্তি লুকায়ে রহে,
নরহত্যাই সবচেয়ে হল লঘুতম অপরাধ।

৫

বিভীষিকা আর বীভৎসতার হল সবে উপাসক,
কাপালিক-ব্রতে সিদ্ধি লভিতে শখ।
মানুষ তো আর নহে কল্যাণ কৃৎ,
ধ্বসিয়া গিয়াছে সাধু-সমাজের ভিত,
জ্ঞানের আলোক কালাগ্নি হয়ে জ্বলিতেছে ধক্ ধক্।

৬

নগরী যখন পুড়িত তখন 'নীরো' বাজাতেন বীণা,
তাতে ছিল তবু সুর শিল্পীর চিনা।
বীণা না বাজায়ে 'বোমাই' বাজায় যারা
নীরোর চেয়ে কি বেশি সদাশয় তারা?
দহে হিরোসিমা, তপে বর চায় ধ্বংস, হিংসা, ঘৃণা।

৭

সভ্যতা এল সূক্ষ্ম শরীরে পরমাণু পর্যায়ে;
'র‍্যাটল' সাপের 'টোটেম' তাহার গায়ে,

হাতে ঠগী-ফাঁস, কনক-কলস কাঁখে,
উচাটন আর মারণ মন্ত্র হাঁকে,
বিভেদ এবং বিপ্লব ডাকা মঞ্জীর তার পায়ে।

৮

'কেপুয়া' হইতে রোমের পথেই গতি তার অভিরাম,
ঘৃণ্য যা তাই লাগিতেছে অবিরাম।
সৃষ্টি যে আজ পুষ্টি চাহিছে দিতে
ইতিহাসে নয়, গোয়েন্দা কাহিনীতে।
ইহার লাগিয়া অপেক্ষমাণ পম্পির পরিণাম।

এহ্যেহি

হে, প্রভু আসিছ তুমি কি?
রাঙা হয়ে কেন উঠিতেছে ধরা জানিতে পেরেছে ভূমি কি?
জনসমুদ্র কেন উতরোল?
কোথা থেকে উঠে হেন কল্লোল?
আবর্তময় যত পল্বল দেখিয়া দাঁড়াই থমকি।

২

তুমি কি আসিছ হে কেশব?
রয়ে রয়ে মোর কানে যে পশিছে তব অশ্বের হ্রেষারব।
খর করবালে রক্তের রেখা—
করে ঝলমল, কেন যায় দেখা?
মণ্ডলী রচি নর্তন করে নারায়ণী সেনা ও কি সব?

৩

ওকি উৎসব মরণের?
এই চরাচর ইঙ্গিত পেল বুঝি তব অবতরণের।
উন্মাদনায় যায় জীব মরি,
কদম্বরেণুসম পড়ে ঝরি—
হিন্দোলে এসে ঘন দোল দেয় কোন্ সে শঙ্কাহরণের?

৪

কুসুমে ঢেকেছে পিয়ালে,
জীর্ণ শীর্ণ মৃতকল্পেরে এমন করে কে জিয়ালে?

প্রলয় দোলের রাঙা পিচকারি
বিস্মিত ভীত—চিনিতে যে পারি,
ভুবন ভরিয়া উড়ে রাঙা ফাগ ও মরণবাহী খেয়ালে।

৫

দেখি আঁখি মেলে কি করি?
কিরীটে তোমার কোটি সূর্যের কিরণ পড়িছে ঠিকরি।
তীব্র জ্যোতিতে হারা হল সব,
তুমি ছাড়া নাহি কিছুই কেশব,
ছন্নছাড়া এ বিশ্বে বাঁধুক তোমার প্রেমের নিগড়ই।

৬

বট হে, তুমিই বট হে,
পাঞ্চজন্য কম্বুনিনাদ পশিছে কর্ণপট হে।
নহে আনন্দ, নহে সৎ চিৎ,
এ বিশ্বরূপ লোকক্ষয়কৃৎ,
নূতন যুগের করিতে সূচনা হলে প্রলয়ের নট হে।

৭

কই শার্ঙ্গ ও পাণিতে?
দুষ্কৃতদলে দলিতে আসিছ, সাধুরে অভয় দানিতে।
মহাসমুদ্র উঠিছে ফাঁপিয়া,
জীবময়ী ধরা উঠছে কাঁপিয়া,
করাল কোটাল জোয়ার আসিছে শফরী পেরেছে জানিতে।

৮

ধরাতলে লুটে প্রণমি,
ভুবন টলানো তব আগমন এই লীলা গণি চরমই।
বহুদিন পরে আসিছ আবার
উদ্বেল করি সুধাপারাবার—
রেখে যাই নতি—জানিনে রহিব কোথায় কি হয়ে জনমি।

অর্জুন

মহাপ্রস্থান ঘনায়ে আসিছে, স্থির হয়ে আছে দিন,
যাবে পাণ্ডব—ধরা বান্ধবহীন।
কর্মব্যস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ আজি অবসাদময়—
এবার যাত্রা দিগ্বিজয়ের নয়।

নগরের আলো মিটমিট করে, নীরব নাট্যশালা—
বিরাট বিদায়-আরতির এল পালা।
রাজকার্যেতে শ্লথ শৃঙ্খলা, কঠোরতা চারিপাশে,
বসন্ত যায়—জানায় নিদাঘ আসে।
পার্থ সমীপে দাঁড়াল জনেক চিত্রশিল্পী আসি,
আলেখ্য তার দেখাইতে অভিলাষী।
কহিল বিনয়ে, "হে পরন্তপ, তোমার কীর্তিগুলি
রঙে ও রেখায় এঁকেছে আমার তুলি।
সর্ব দেশের সর্বকালের অগ্রগণ্য বীর
হেরি আনন্দে ঝরে মোর আঁখি-নীর,
তন্ময় হয়ে আঁকিয়াছি ছবি দ্বাদশ বর্ষ ধরি,
সময় হবে কি? দেখিবেন দয়া করি!'
লভি অনুমতি, শিল্পী তাঁহাকে দেখান চিত্রাবলী
যেন সজ্জিত পুষ্পের অঞ্জলি।
যাজ্ঞসেনীর স্বয়ম্বরের সভা ওই দেখা যায়,
চন্দ্রের পরিমণ্ডল ধরা গায়।
মৎস্য-চক্র ভেদ করিছেন কিশোর সব্যসাচী,
বিপুল জনতা হেরে সাফল্য যাচি।
চিত্রসেন ওই দুর্যোধনকে কুরুকুলবধূসহ
ধরে লয়ে যায়—লজ্জা দুর্বিষহ।
শরজালে তার পথ রোধ করি রোষে ফাল্গুনী কন,
'চেন না উনি কে? নৃপতি দুর্যোধন।
বিচার-বিমূঢ় জেনো ভায়ে ভায়ে কলহ থাকুক যত
আজ মোরা ভাই পঞ্চোত্তর শত।
রণে মহাবল চিত্রসেনকে বন্দী করিয়া আনি
ওই শুনিছেন যুধিষ্ঠিরের বাণী।
বিরাট গোগৃহে যুঝিছেন দেখ বৃহন্নলার বেশে—
চেনে শত্রুরা শরের আঘাতে শেষে।
তারপর হের কুরুক্ষেত্রের কপিধ্বজের 'পর
মুহ্যমান সে পার্থ ধনুর্ধর!
কৃষ্ণের তনু মাধুর্যময় স্বেদের বিন্দু ভালে,
বাণীরূপা গীতা আলোক অন্তরালে।
শরশয্যায় তৃষিত ভীষ্ম, গাণ্ডিবী চঞ্চল,
ভোগবতী ধারা উঠে ভেদি ধরাতল।
ওই দহিছেন খাণ্ডব-বন, ওই হের শরে শরে
রচিছেন সেতু নীলাম্বুধির 'পরে।

যত বিক্রম যত লাবণ্য, সংযমী ততো তিনি,
অভিমানে ফেরে উর্বশী গরবিনি।
প্রতি চিত্রটি রঙে অনুপম, নাহিকো অঙ্গ হানি,
জয়-মুখরিত জীবন-নাট্যখানি।
হেরিয়া পার্থ প্রীত-বিস্মিত, শিল্পীরে ডাকি কন,
'সত্যই তব চিত্র অসাধারণ।
কিন্তু কেন এ রঙ ও রেখার করিয়াছ অপচয়?
তব অর্জুন এ অর্জুন তো নয়।
ও অর্জুন যে চির-কিশোরের বন্ধু ও অনুচর.
দেখিছ না মোর নিত্য রূপান্তর?
তোমার দিব্যবর্ণে তুলিতে তিনি রহিলেন বাঁচি,
মহাপ্রস্থান-পথে আমি চলিয়াছি।
একটি ছবি যে, হে চিত্রকর, আঁকিতে রেখেছ বাকি,
ভবিষ্যৎকে এখনি দিয়ো না ফাঁকি।
তোমার অজেয় ওই অর্জুন কৃষ্ণ সারথি হারা
কত অসহায় জানে দর্শক যারা;
ছিল না শক্তি তুলি গাণ্ডীব শত্রুকে রোধিবার,
লুটে নিল তারা দ্বারকার ভাণ্ডার।
তাঁহাকে খেলার পুতুল করিয়ো, কৃষ্ণকে বাজিকর,
সে ছবিই হবে সত্য ও সুন্দর।'

বিন্ধ্যের আনন্দ

গর্বিত মন, অভ্রংলিহ শির
যেন বিস্ময় মুগ্ধ ধরিত্রীর।
বিন্ধ্য মূর্ত দম্ভ দর্প ক্রোধ
উঠিছে করিতে সূর্যকে অবরোধ।
দাঁড়ালেন তার সমুখে সহসা আসি,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি বদনে মধুর হাসি,
ঋষি অগস্ত্য, বিন্ধ্যের গুরু তিনি,
করেন সাগর গণ্ডুষে পান যিনি।
উদ্ধত গিরি সচকিত সম্ভ্রমে
হেরি গুরুদেবে ভূমে লুটাইয়া নমে।
বিন্ধ্য গুরুর পদরজ—অভিষেকে
নবীন চেতনা লভিয়া ভুবন দেখে।

কোথা অহমিকা আত্ম প্রতিষ্ঠার,
আত্মসমর্পণে-ই তৃপ্তি তার।
সূর্যকে রোধ করুক যাহারা পারে,
বিন্ধ্য বিলীন একটি নমস্কারে।
প্রতাপ-পিয়াসী পাহাড় নহে সে আর,
অফুরন্ত সে একটি নমস্কার॥

গ্রামের পথে

আমার গ্রামের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন,
যেমন নদীর ঢেউয়ে নাচে প্রভাত-সমীরণ।
পরিচিত পথের গাছে
কি মমতাই মাখা আছে,
ঘাসের ছোট ফুলটি যেন করছে আলাপন।

এমন শ্যামল এমন কোমল লতা কোথায় আর!
ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে শীর্ণ তনু তার!
কি যেন এ পথের ধূলি
করলে নরম সোহাগগুলি,
সূর্যকরে পাই যেন তার করের পরশন।

ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই—
এই গ্রামেতেই দিয়ো দয়াল ফিরে আমার ঠাঁই।
দেবালয়ের এ অঙ্গনে
আসব আবার শুভক্ষণে,
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপুরী নন্দন-কানন॥

পুরানো বাড়ি

শিউলির গাছ দুটি দুয়ার গোড়ায়
তলে ফুল বিছাইয়া ফিরাইতে চায়।
দক্ষিণে সারি সারি হাস্নুহানা,
ছেড়ে যেতে-বার বার করিছে মানা।

মালতী মাধবী বেলা চামেলী ও জুঁই
আমার প্রিয়ারে বলে—'কোথা যাবি তুই!'
আম তাল বেল তরু বলে—'কিবা ভয়!
মোরা আছি, তোরা থাক, ফাঁপুক অজয়।'

২

মাথা নাড়ে বেণুবন, ওই বুড়া বট,
বহু দিন কাটায়েছি তাদের নিকট।
শাখে শাখে আজো পিক পাপিয়া ডাকে,
মৌমাছি গুঞ্জন করিতে থাকে।
এখনো ছাড়েনি বাড়ি কপোতগুলি,
বুলবুলি ঘুরে ফিরে আসে কেবলি ;
এখনো আসিছে ঝাঁক কাক শালিকের,
সঙ্গ ছাড়েনি তারা গৃহ মালিকের।

৩

অর্ধেক ভিটে হল অজয়ের চড়া,
তবুও তা এ কি কত মাধুরীভরা।
আধা তার স্বর্গেতে আধেক ধরায়,
জোড় মানাইতে দোঁহে সুধা যে গড়ায়।
কল্পনা বাস্তব দুই তীরে হায়
মুখোমুখি হয়ে আছে চখাচখী প্রায়।
পূর্ব ও উত্তর মেঘের মাঝার
এ অজয় যক্ষের চক্ষের ধার।

৪

মোর প্রিয় বাড়ি বটে ভাঙিছে অজয়,
সে দরদী শিল্পী যে দেয় পরিচয়।
শোভে বাড়ি, আহা একি ভাঙনের ছাঁদ!
মহাকাল-ভালে এ যে তৃতীয়ার চাঁদ।
মনে ভাবি, ভাসাইল কে কৃপা করি
মন্দাকিনীতে মোর কাঠের তরী।
ভাগ্য এ! নর আমি ছিলাম সেথা—
এখন সেখানে বাস করে দেবতা।

৫

করি আমি জয়দেব-পাদোদক পান,
আমার এখানে বহে অজয় উজান।

বলে নদী কলকল মধুর স্বরে—
জলধারা দিয়ে আনি লক্ষ্মী ঘরে।
অভিষেক অন্তে অ-মৃত নীরে তার
অপরূপ হয়ে গৃহে ফিরিবে আবার।
সেই সুখ উৎসব শান্তি নিবিড়
পুনরায় তার বুকে পাতিবে শিবির॥

স্মৃতির খেয়াল

বিস্মিত হই, হই যে অবাক-স্মৃতির খেয়াল দেখে,
কত সমারোহ ঢেকে মুছে দেয়, ছোটখাট ছবি রেখে।
কোথা বর্ণের উজ্জ্বল ছটা—কেমনে এমন ঘটে?
ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ ক্ষণিকের ছবি অটুট চিত্তপটে।
কারে কি যে দেয় দর!
শুকায় বারিধি বড় বড় নদী, বহে যায় নির্ঝর।

২

আষাঢ়-গগনে নব ঘনঘটা দেখাল যে মোরে ডাকি,
মুরতি তাহার সে শোভার সাথে স্মৃতি যে রেখেছে আঁকি।
কতই আষাঢ় এল গেল পুন করিনি তাদের খোঁজ,
বিচিত্র এই চিত্রে দিয়েছে নূতন রঙের পোঁচ।
ব্যাপার কি অদ্ভুত!
দামি হল মোব জীবন-আষাঢ়ে মেঘ চেয়ে মেঘদূত?

৩

মাঠের মাঝারে রেলের স্টেশন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে
বন্ধু এলেন, তুচ্ছ ঘটনা—অঙ্কিত আছে চিতে।
তিনি নাই আর, নামি গাড়ি হতে—দ্রুত চলে যায় ট্রেন,
তীর্থ হয়েছে এখন আমার সেই সে ইষ্টিশেন।
স্মৃতি বেছে নিল কি রে—
গোলাপগুচ্ছ. চম্পক ফেলি—ছোট আকন্দটি রে?

৪

গভীর রাত্রে চলেছে গো-গাড়ি, 'আউচ' ফুটেছে কোথা?
এখনো আমার বক্ষে তাহার গন্ধের মধুরতা।

ভুলেছি জলসা বাদ্য ভাণ্ড নৃত্য-গীতের জাঁক,
মনে পড়ে শোনা সুদূর 'চুনারে' সাঁঝ-শিয়ালের ডাক।
বলেছিনু, ওগো দেখো—
উহাদের সাড়া বিনা আমাদের সন্ধ্যা মানায়নাকো।

৫

বাঙালিবাবুটি 'সান্তারা' কেনে ফেরিওয়ালাকে ডাকি,
'আম্বালা'র এক ভুবন দুয়ারে, সেটা স্মরণীয় নাকি?
ক্ষণিক আলাপে 'লুণ্ডি কোটালে' হাতে দিল মোর হাসি'
দুইটি আপেল, যুবক জনেক 'খাইবার-পাস' বাসী।
কোথা বড় বড় দান?
স্মৃতি করিয়াছে কেন জানিনাকো উহাই মূল্যবান।

৬

মনে পড়ে দূরে ছাদ হতে সেই রুমাল ওড়ানো কার?
কাঁদে ছোট নাতি, মেলা হতে ঘরে ফেরে শিখ সর্দার।
জালন্ধরের সরিষার ক্ষেতে এখনো কেন যে স্মরি—
দাঁড়াইয়াছিল কৃষক বালিকা রঙিন ঘাঘরা পরি।
ঢেকে আছে মন গোটা—
রামধনুকের সপ্ত রঙের এইসব ছিটেফোঁটা।

৭

চলেছে মোদের স্টিমার সজোরে, শুনিলাম যেতে যেতে,
'মণিপুরী'দের নৃত্য হইবে চণ্ডীমণ্ডপেতে।
আলো লয়ে সবে করে ছুটোছুটি, আনন্দে উৎসাহে,
অপেক্ষমাণ গ্রামবাসিগণ আগ্রহে পথ চাহে।
শাবাস স্মৃতির দাবি!
মণিপুরী দল এল কি না সেথা এখনো তা আমি ভাবি!

৮

স্মৃতির খেয়ালই রঙিন ঝুলিতে আহরি রেখেছে, মরি,
সুদীর্ঘ মোর জীবনপথের এইসব মাধুকরী।
কোথাও সিঁদুর আবিরের দাগ, প্রসাদের রেণুকণা,
তীর্থ মহিমা মাখান মধুর গন্ধের আনাগোনা।
উৎসব গেছে মুছি—
মনে ভেসে আসে চালচিত্রের ভাঙা রাঙতার কুচি।

ক-খানা পুরানো রেকর্ড

সারানো হয়েছে পুরানো সে গ্রামোফোন,
খোকাখুকিদের নাই কোন আর কাজ।
বাজাইছে বসি—করি বেশ আয়োজন
বহু পুরাতন রেকর্ড ক-খানা আজ।
সেই সে কণ্ঠ, সেই গান সে আসর
নিঙাড়ি নিঙাড়ি তেমনি সে মধু ঢালে
অতীত শ্রোতায় যেন ভরে গেছে ঘর
সব ফিরে আসে সুরের ইন্দ্রজালে।
ঝরা ফুল পুন দেখা দেয় হয়ে কুঁড়ি
সেই পরিজন ফিরে যেন আসে ঘরে।
ভগ্ন তমালে ঝুলনের রাঙা ডুরি
উতল বাতাসে পরান ব্যাকুল করে।
ফিরে নিয়ে আসে সেই মুখ সেই হাসি
মনের যযাতি যৌবন ফিরে পায় ;
গোদাবরী নীর সরযুতে মিশে আসি
বহায় উজান জীবনের যমুনায়।
'ভালো হল বঁধু'—এই সেই গান বটে
ভোরেতে বাজিত লাগিত বড়ই ভালো।
সেই সে প্রভাত আনিল সন্নিকটে
দূর অতীতের হারানো দিনের আলো।
হাসির এ-গান—কত-না হেসেছি শুনে
সে সকল জুঁই কখন গিয়াছে ঝরি,
রেখেছিল কে তা সাধের সাজিতে গুনে
এনে হাসিমুখে সুমুখে যে দিল ধরি।
ক-খানা রেকর্ড—কালো কালো কটা চাকি—
কালের চক্র ফিরাল এমন দ্রুত
রেখাতে রেখেছে কত আনন্দ ঢাকি,
গত উৎসব নিশি যেন ঘনীভূত।
মনে দোল দেয়, সহসা ফিরায়ে আনে
রঙিন বুকের রাঙানো আকাশ গোটা;
দেখি নাই হেন হাসি-অশ্রুর বানে
শুষ্ক এমন মালঞ্চে ফুল ফোটা।

জাতিস্মর

অলকনন্দা-পুলিনে একটি বাড়ি—
তুহিনের ভয়ে অতিথি হলাম তারি।
আত্মীয়তায় মনে হল সারারাত
একটা জন্ম কেটেছে ওদের সাথ।
একদা নিশীথে স্তব্ধ মৌন সব,
চমকি উঠিনু শুনিয়া বংশীরব,
সে সুর এমনি পরিচিত আর প্রিয়,
ডাকে যেন দূর জন্মের আত্মীয়।

কভু যমুনায় কভু সরযুর তীরে,
নারায়ণে আমি হেরেছি নরের ভিড়ে।
ভিক্ষু হইয়া ছিলাম অজন্তাতে,
সোমনাথে আমি লড়েছি পাঠান সাথে।
নিরঞ্জনার তীরে করিয়াছি দান,
মহাপথে আমি করিয়াছি প্রস্থান।
ত্যাগ করি দেহ আমিই কাম্যকূপে,
গিয়েছি এসেছি হেথা নব নব রূপে।

সুন্দর আমি যাহা কিছু দেখি ভবে
মোর দৃষ্টির কষ লেগে আছে সবে।
রয়েছে ধরায় সব সৌরভ জুড়ি
আমার বুকের প্রণয়ের কস্তুরী।
সকল সলিলে আমার অঙ্গবাস,
সব সমীরণে আমারি যে নিশ্বাস।
ঘন অনুভূতি দেয় মোরে সন্ধান—
সকল প্রাণেই রয়েছে আমার প্রাণ।

জন্মান্তর সঙ্গতি

পরিচয় পাই তার
এই পৃথিবীতে এসেছি গিয়েছি আমি যে অনেকবার।
সে-তারার আলো এখনো রয়েছে যে তারকা গেছে ডুবে,
মৃগ নাই, মৃগনাভির গন্ধ এখনো যায়নি উবে।

কত জনমের আঁখির পরশ রয়েছে রূপের গায়,
প্রণয়ের গাঢ় আলিঙ্গন যে দাগ রাখিয়েছে তায়।
চেনা-চেনা লাগে দেখে—
মাণিক্যহারে রয়েছে আমার বুকের পরশ লেগে।

সকল শব্দ ভাষা ও কাকলি, সব সুর সব গীতি
আমার জিহ্বা কণ্ঠ তালুর বহিতেছে পরিচিতি।
সুরের মীড় যে কোন্ নীড়ে ডাকে ভাবিয়া পাই না সীমা,
বিস্মৃত প্রিয় কতই কণ্ঠ দিল ওতে মাধুরিমা।
ভালো-লাগা সব বর্ণে গন্ধে, ভালো লাগা সব গানে
জন্মান্তর সৌহার্দ্যের অভিজ্ঞান যে আনে।
পাইনি অমর বর,
যুগের যুগের প্রেম শুধু মোরে করেছে জাতিস্মর।

স্পর্শে গন্ধে রসে কী আভাস, কী যে ইঙ্গিত রয়,
প্রতিটি শৈলে রয়েছে আমার শিলালিপি মনে হয়।
হেথাকার প্রেম স্নেহ মমতায় অফুরন্তের চিনে
আগন্তুকেরা ধরাকে বেঁধেছে অপরিশোধ্য ঋণে।
লয়ে যে বিপুল পণ্য এমন করি হেথা কারবার
একটি জনমে হিসাব-নিকাশ চুকিতে পারে না তার;
তাই এই গতায়তি
অপার্থিবের পরিবেশে করে ধরাকে কান্তিমতী।

এসেছি গিয়েছি এটা ঠিক জানি, দিয়ে নিয়ে গেছি কী?
নিয়ে গেছি এর বেদনা, দিয়েছি বুকের সামগ্রী।
রূপে রূপবান ওই লাবণ্য, ওই যে আকর্ষণ
ফিরিয়া আসিতে বার বার মোরে করেছে নিমন্ত্রণ।
বিদায়ী নয়নে সেই রূপ ভাসে ত্যজিতে যা ব্যথা বাজে,
ধরার কঠিন বন্ধন তাই পুনরাগমন যাচে।
অমৃতের কণা বহি
এসেছি গিয়েছি ধরার প্রেমকে করিবারে কালজয়ী।

জালন্ধরের পথে

পাংশু-বরণ পথ চলেছে অন্ত নাহি তার
সরষে এবং গোধূম ক্ষেতে সবুজ চারিধার।
ইস্টেশনে টোঙা মোটর এক্কা গাড়ির ভিড়,
পায়জামা আর পাগড়ি টুপির অরণ্য নিবিড়।

সলাজ আঁখি নাই প্রাসাদের জানালা ফাঁকে,
জল আনিতে যায় না বধূ কলসি কাঁখে।
বঙ্গবধূর মধুর শোভা বঞ্চিত দেশে
ভুল করেছি ভাবছি আমি সখ করে এসে।

২

এমন সময় কে ও এল হরিণ নয়না,
কাঁচা সোনার ঢেউ খেলিয়ে, কথাটি কয় না।
পালটে চেয়ে এগিয়ে গেল রূপের বিজলি
ঝাপসা দিনের সন্ধ্যা বেলা শোভায় উজলি।
নয়ন সে কি, সে যে গভীর প্রেমের সরসী,
চলে গেল পদ্ম বুকের পরাগ বরষি,
সেথায় পেলাম হলুদ পরীর হঠাৎ দরশন
জালন্ধরের পথে আমার আজও বেড়ায় মন।

৩

কুঞ্চিত কেশ চাঁদ মুখে তার পড়ছে আকুলি—
ভুল করিয়া চাঁপার দলে বসল কি অলি!
সান্ধ্য তারার কাঁচপোকা টিপ পরার কি মরসুম,
কোকিলকে কি ডাকলে ক্ষেতে কাশ্মীরী কুঙ্কুম?
ছলছলে সে রূপের নদী যায় না পসরা,
চাউনি তাহার বঙ্গবালার অমৃতে ভরা।
সেথায় আমার আটকে গেল এই দুটি নয়ন
জালন্ধরের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন॥

অশরীরী

ত্যক্ত বিশাল ভগ্ন ভবন—ঘন জঙ্গল মাঝে,
সেখানে সতত আলো-আঁধিয়ার ঝিঝির ঝাঁঝর বাজে।
ছিন্ন সৌধ মালা: স্মৃতির বন্দিশালা
তোরণে তাহার কুতূহলী হয়ে পঁহুছিনু এক সাঁঝে।

ডাকিলাম জোরে, 'কোথা পুরবাসী? কোথা ওগো পুরবাসী
লও ডেকে লও, অতিথি তোমার দ্বারে যে দাঁড়াল আসি।'
ধ্বনিত হইল গেহ আসিল না কই কেহ,
শুধু পেচকের কর্কশ রব সাড়া দিল উপহাসি।

দ্বিতলের সব কক্ষে কক্ষে, বায়ু বহি সনসনি
গত গৌরব গম্বুজগৃহে তুলিল প্রতিধ্বনি।
কে যেন বলিছে' আজো আছ কি তোমরা, আছ?
শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে আমরা যে দিন গুনি।'

সুবৃহৎ বট রচি মণ্ডপ 'নামালে'র পাকে পাকে
রয়েছে দাঁড়ায়ে, চীনা ফাহিয়ান হয়তো দেখেছে তাকে।
দমকা বাতাস লাগি শিলা-ছবি উঠে জাগি
বলে 'আমাদের ভরা ঘুমে কে রে গায়ে হাত দিয়া ডাকে?'

রঞ্জিত যেন হয়েছে বাড়িটি যুগের যুগের কষে,
ডালিমের গাছে ডালিম ধরেছে, ফেটে পড়ে রূপে রসে।
ফুটিয়া হয়েছে ফুল কাহার হয় যে ভুল!
মানুষ মরে কি ফুল ফল হয়। আমি ভাবি হেথা বসে।

ভগ্নস্তূপে উঠেছে যে-সব বলিষ্ঠ তরু-লতা,
শাবাসি তাদের উদ্দাম গতি, অরণ্য সরসতা
যাহাদের এই ঘর, এরা কি তাদের পর?
পায়নি কি রূপ এতেই তাদের বক্ষের ব্যাকুলতা?

হাজার বছর আগে এ আবাসে ছিল যারা পরিজন,
অনিন্দ্য শত মুখচ্ছবি যে করেছি নিরীক্ষণ,
সুমুখে ঘুরিছে তারা, জরা ও মৃত্যু হারা,
রূপ যে অমর, যুগে যুগে তার নাহি পরিবর্তন।

কণ্ঠের স্বর তেমনি—সুর যে অবিনশ্বর ভবে,
গুণী মহাকাল মধুরতা তার কেমনে কাড়িয়া লবে?
সুরভিত চারিপাশ করে কস্তুরী বাস,
সুবাসিত যাহা করিত সুদূর অতীত মহোৎসবে।

হাজার বছর কয়টা বা দিন কয়টা বা নিশ্বাস?
হাজার বছর ত্র্যম্বকের যে একটা অট্টহাস
মাটির প্রদীপে হায় একটা দীপালি যায়,
বিসর্জন তো নব বোধনের কেবল পূর্বাভাস।
এখানে জমেছে কালের কুহেলি ঘন যবনিকা প্রায়,
রহস্যময় করি চরাচর আবরি রাখিতে চায়।
মোরা ধরণীর প্রাণী ধরাই আসল জানি,
তাহাকেই যেন ছায়া মনে হয় এ ভবন আঙিনায়।

এখানে যা শুনি তাহাই তো ধ্বনি, প্রতিধ্বনি তো নয়,
আমরা যা বলি তাহাদেরই কথা নাহি তাতে সংশয়।
স্পন্দন তাহাদের এই বুকে পাই টের,
তাহাদের ব্যথা দুশ্চিন্তাই হয়ে আছে অক্ষয়।

আসল ভুবন কোন্‌টা তারাই জানে বুঝি সন্ধান,
তাদের জগৎ স্থির—আমাদের সদা দোদুল্যমান।
ভাবি মোরা যাবে যেথা উহারা রয়েছে সেথা
যে-সুধার মোরা পিয়াসী—তারা তা আগেই করেছে পান।

কর্ম তাদের দিযে চলে গেছে লভিবারে বিশ্রাম,
সেই যে আদিম ভীতি ও ভাবনা মোরা সহি অবিরাম।
সেই চলা-পথে চলি সেই বলা-কথা বলি,
মোদের সাধনা পূর্ণ করিছে তাদেরই মনস্কাম।

তাদের খবর অধিক কি পাব মাটি বা পাথর খুঁড়ে,
এখন তাহারা বসত করিছে নিখিল ভুবন জুড়ে।
ডাকিয়া বলিছে আজো আছ কি তোমরা আছ?
দেবতার কাছে আছি বটে, নাই তোমাদের বেশি দূরে'।

মাটির মায়া

স্বর্গে আবার ফিরিয়া এসেছি গুরু অভিশাপ অন্তে।
তবুও সতত চঞ্চল মন,
ধুলার ধরণী করিছে স্মরণ,
গুমরি তাহার পূরবীর সুর আসে স্বরগের পন্থে।

বধূ হয়ে ছিনু সেখানে রম্য সুধা-ধবলিত কক্ষে,
প্রেমিক স্বামীর সে কি রে সোহাগ,
এখনো মোছেনি চুম্বন দাগ,
ধরার প্রেমের পদ্মপরাগ আজো মোর সারা বক্ষে।

সেখানে ছিলাম লাজ-নতমুখী সবার আদরে ধন্যা,
ভরা যৌবনে সাজানো সে-ঘর
এখনো ভাসিছে চোখের উপর,
এখানে এসেও আছাড়ি পড়ে যে আঁখিতে অশ্রু-বন্যা।

ভুবনের পাশে স্বচ্ছ তটিনী নামটি তাহার কৃষ্ণা,
আকাশ গঙ্গা সাথে তার যোগ
দেখিয়াছি সাধ করি উপভোগ,
ধরার ক্ষুদ্র শিশিরের বুকে রয়েছে সুধার তৃষ্ণা।

সবে আলোড়ন সোহাগের দোল, সে এক মধুর বিশ্ব,
জানি তাহাদের গতির কী মানে,
ছুটেছে কোথায় কার সন্ধানে
তুচ্ছ সে ধরা—তবু দেবতার দেখার মতন দৃশ্য।

হোক নশ্বর, হোক মায়াময়, হোক না ধরণী রিক্ত,
তবু প্রেম তার কমনীয়তায়,
তবু আঁখিজল তাহার ব্যথায়—
ইন্দ্রজাল যে ইন্দ্ররাজ্যে করে তারে অভিষিক্ত।

লাল যাত্রী

যারা কেবল হাসায় এবং হাসে
আলতা দুধের ঢেউ খেলায়ে আসে,
যাদের পরিমণ্ডলেরে ঘিরি,
নবৎ বাজে, রঙ ছোড়ে পিচকিরি,
পৌষের শীতে পদ্ম ফোটায় যারা,
উৎসবে দেয় নিতুই বসুধারা,
রঙের খেলায় খেলে দিবস ব্যাপি,
কণ্ঠে যাদের 'আশা', 'ললিত', কাফি—
আমার মনে জাগে যে সংশয়
ঝরে বুঝি মুক্তো তারাই হয়।
পারিজাতের শাখায় তারা ফোটে
রামধনুকের রঙের মেলায় জোটে।
হর্ষে এরাই ঘোরায় রবির রথ,
স্পর্শে এদের জাগল ছায়াপথ।

আজিকে রাতি

প্রিয়া, সেই প্রিয় পূর্ণিমা রাতি, সেই চম্পক সুরভি—
বাজে দরবারি কানাড়া কোথাও, কোথাও বেহাগ পূরবী।
সমুখে মাধবী তেমনি শ্যামলা, শাখে থলো থলো কুঁড়ি গে
বরণ-পিঁড়িতে এখনো রয়েছে পুরানো এলুন গুঁড়ি গো।
কোকিলের ডাক তেমনি মদির, কই তো হয়নি পুরাতন?
মণি-মঞ্জীর—ঝঙ্কৃত-নিশি বাজে কঙ্কণ কনকন।
এ রাতি করেছে মধুরা
যুগের যুগের কিশোর-কিশোরী জগতের বর-বধূরা।

২

হয় তো এমনি আলোক-তিথিতে তুমি যা বলেছ মিছে নয়,
হল সাবিত্রী-সত্যবানের শুভ দৃষ্টির বিনিময়।
আজো শোনা যায় কলধ্বনি যে সেই স্রোতবহা মালিনীর
বেতসকুঞ্জ তেমনি শোভন, হয়নি বদল অবনীর।
চন্দ্রাপীড় আর কাদম্বরীর বাসর-জাগা এ রজনী,
কত চাঁদ মুখ সুধা দিয়ে এর গরব বাড়াল সজনি।
যায়নি, যাবার কিছু নয়—
তৃষিত অধর উৎসুক বুক তেমনি রয়েছে সমুদয়!

৩

এই সুধাময়ী ক্ষুধাময়ী নিশি বুঝিতে পারিনি কী বটে!
নৃত্যে ইহার একটি ভঙ্গি প্রিয়তমে ডাকে নিকটে।
সুধার গাগরি কক্ষে ইহার চুনুরিয়া শাড়ি পরনে,
লালে লাল করি চলে সুন্দরী অনুরাগ রাঙা চরণে।
কতই শিরিন কতই ফরহাদ, কত জুলিয়েট রোমিও
কুসুম-বিছানো এই পথে গেল, তারপর তুমি আমিও।
এ-নিশি কি কেহ ভোলে গো?
অমর হয়েছে রাই ও কানুর ঝুলন রাসের দোলেও।

৪

লাগে নাকি ভালো? মোর ভালো লাগে, ভালো লাগে মোর অতিশয়,
পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে এই নূতনের অভিনয়।
সুরভিত হল যে নিশি মোদের স্মৃতির গোলাপী আতরে,
তরুণ-তরুণী গোলাপ গোলাপে সাজাইছে তারে আদরে!

আছে পথ-চাওয়া সেই গান-গাওয়া বহে সেই হাওয়া অনুখন,
ফোটে সেই ফুল সেই গাছ আজো, সেই সে বিরহ সে মিলন।
সে-বাঁশিই বাজে অবিরাম
উহাদের খেলা আমাদের চোখে লীলা হয়ে রাজে অভিরাম।

মহাকাল

তুমি চলিয়াছ অনন্ত পথে, নীরব পদক্ষেপে,
হে অতন্দ্রিত, যুগ-যুগান্ত ব্যেপে।
কণ্ঠ তোমার বেষ্টিত হাড়-মালে,
ধক্ ধক্ করে বহ্নি তোমার ভালে,
বাজে ডম্বরু, ভুজগ গরজে ধরা উঠে কেঁপে কেঁপে।

২

শিলা-মর্মরে মানুষ মাটিকে আকাশে তুলিছে বটে
ফিরে আসে মাটি মাটির সন্নিকটে।
কত প্রতিমার হেরিছ নিরঞ্জন,
কত রাজ্যের উত্থান নিপতন,
তুমি কোনো রঙ স্থায়ী রাখনাকো মাটির ধূসর পটে।

৩

কাল ব্যাবিলন আজ লন্ডন, কোথায় পরশ্ব ?
কে বুঝিবে তব গতির রহস্য ?
এই প্রচণ্ড আণবিক সভ্যতা
দেখিতে দেখিতে হয়ে যাবে উপকথা,
ক্ষয়ে খসে গেল কত রবি-শশী রেখে শুধু ভস্ম।

৪

যেখানে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজকীয় দপ্তর,
হয়তো সেখানে জমিবে তুষার স্তর।
শ্বেত ভালুকেরা আসিয়া বাঁধিবে ডেরা,
বল্গা হরিণ সহ সীল-মৎস্যেরা,
পেঙ্গুইনের ঝাঁকে ডেকে এনে বাঁধাবে গোপন ঘর।

৫

অভ্রংলিহ জয়-তোরণের জংধরা ইস্পাত,
ভূমিসাৎ হবে হয়তো অকস্মাৎ।

মানুষের গুরু-গর্বিত ইতিহাস
জাগাবে কেবল তোমার অট্টহাস,
তব পঞ্জিতে তাহাদের আয়ু হয় তো একটা রাত।

৬

পতনের গতি কারো দ্রুত অতি কারো কিঞ্চিৎ ঢিমা
সীমা-শেষে গিয়া সব হবে হিরোশিমা।
পরিণামে এক শ্মশানে সবারি ঘর,
সাথে রবে শুধু তুমি শ্মশানেশ্বর,
লয়ের আঁধার হতে ফুটাইবে সৃষ্টির অরুণিমা।

৭

তাসের দুর্গ, পাতার প্রাসাদ, কাগজের রাজধানী,
সৈকতে তারা জলরেখা যায় টানি,
পঞ্চভূতেরা গায়ে রাখেনাকো ছোপ,
দগ্ধ মগ্ন করে ভেঙে করে লোপ,
মানুষ কিন্তু করিতেছে তবু অমৃতের সন্ধানই।

৮

ভঙ্গুর ভাঙা পানপাত্র ও রাঙা বোতলের সার
পরিচয় দেবে বিরাট সভ্যতার।
ক্ষয়া ইঞ্জিন, উড়োজাহাজের চাকা,
বোমার টুকরা, ফাঁসি কাঠ মাটি ঢাকা,
সৃষ্টিবিনাশী কৃষ্টির হবে সাক্ষী চমৎকার।

৯

তব সাথে চলে কীর্তি-যশের বিপুল পণ্য লয়ে
আহা কতজন জয়-গর্বিত হয়ে!
প্রোজ্জ্বল যাহা কোথা ডুবে যায় নিভে,
নিস্প্রভ হয় পরিণত মণিদীপে,
তোমার নিকট কার কত দর খাঁটি করে দেয় কয়ে।

১০

স্তব্ধ হইবে সকল শব্দ, রবে শুধু ওঙ্কার,
সব রূপ এক-রূপে হবে একাকার।
দুরাশা আমার,—পুড়ে যবে হব ছাই
তোমার অঙ্গে বিভূতি হইতে চাই,
হে দেব রজতগিরি-সন্নিভ—তোমাকে নমস্কার।

খেলাভঙ্গ

নীলকণ্ঠ নামটি তাহার—সুযশ বড় তার,
দেশের সে-যে সবার সেরা দাবার খেলোয়াড়।
কোনো খেলায় হারত না সে এতই তাহার গুণ,
দাবা-খেলায় কুরুক্ষেত্রে সে-ই ছিল অর্জুন।
ভঙ্গি খেলার দেখত শত নয়ন সতৃষ্ণ,
বিজয় তারি—সারথি তার বুঝি শ্রীকৃষ্ণ।

একটি দিবস চলছে খেলা—ঘটল অঘটন—
নীলকণ্ঠ উৎকণ্ঠায় বিষণ্ণবদন।
'চটে গেল বাজি এবার' বলিয়া চঞ্চল—
ছকটি দাবার উলটে রাখে নয়ন ছলছল।
দেহে মনে সে কী গভীর নিরাশা-চিহ্ন?
বেদনা তার বুঝবে কে আর দরদী ভিন্ন?

'চটে গেল বাজি'—এ তো সহজ কথা নয়,
এ যেন এক দিগ্বিজয়ীর ভাগ্য বিপর্যয়
এ যেন রে অভ্রভেদী আকাঙ্ক্ষা চুরমার,
চটল বাজি ভগ্ন হৃদয় ভাবিছে হিট্‌লার।
'লালকেল্লা' বৃহৎ দূরে, চটল যে বাজি,
'কোহিমা'তে এ যেন রে কাতর নেতাজী।

রিক্ত করে তিক্ত করে জীবন সুদুর্লভ
প্রারম্ভেতে বন্ধ হল রাজসূয় উৎসব।
ফাঁসল পরিকল্পনা তার ডুবল যেন হায়
আশার বিশাল বহিত্র এক—সাগর-মোহানায়।
বিফল হল কী নৈপুণ্য, কী মহা উদ্যম!
এত বড় ওলট পালট—ব্যথা কি এর কম?

অমনি আহা কতই বাজি চটছে দুনিয়ায়,
বার্তা তাহার মর্মব্যথার কজন বল পায়?
জ্যোতিষ্ক যায় উল্কা হয়ে—বিধির অভিশাপ
অসমাপ্ত খেলার বেদন রেখে যে যায় ছাপ
আনে যুগের পুষ্ট আশা কেমনে নৈরাশ
চটা বাজির ব্যথায় ভরা ধরার ইতিহাস।

মায়ার বাঁধন

পথতরু-তলে বসে আছি বিকালে,
পোষাপাখি আসি এক বসিল ডালে।
এখনো চরণে তার শিকলের দাগ,
শিখানো বুলিতে তার ঝরিছে সোহাগ—
মিশিতে পারে না যেন পাখির পালে।

মন দিয়া যত বার আমি শুনিনু,
মুখে তার মধু বোল 'মিন্টু মিনু',
কণ্ঠে বাজিছে ওর তাদেরি বাঁশি,
বনে এসে মন তার আরো উদাসী—
জাদুর মোহন কাঠি কেবা ঠেকালে।

'মিন্টু মিনু'র বাড়ি কোন্ বিদেশে,
হেথা তাহাদেরি কথা বলে সে এসে।
আহা, সারা বনে বনে পাতার ফাঁকে
সারাদিন ঘুরি ফিরি তাদেরে ডাকে—
ঘর, তুমি বনচরে একি শেখালে!

গৃহে থেকে এই দশা বন-পাখিরই,
গৃহী বল কী করিবে লয়ে ফকিরি?
দেখে তার দশা মোর চোখে আসে জল,
কয়টা বছরে তার এতই বদল!
ভালোবেসে দাসখৎ নিজে লেখালে।

শুঁয়োপোকা

বিশ্রী একটা শুঁয়োপোকা দেখি উঠেছে আমার পায়,
শিহরি উঠিনু, কাগজে ধরিয়া ফেলে দিনু আঙিনায়।
ধুয়ে মুছে দেখি যায়নাকো জ্বালা—শুঁয়ার জ্বালা যে ভারি,
ভৃত্য দেখিয়া মারিতে ছুটিল পোকাটিরে তাড়াতাড়ি।

নিষেধ করিনু, পোকাটি ঢুকিল ক্ষুদ্র গুল্ম-বনে,
তাহার কথা তো স্মরিবার নয়—কাজেই ছিল না মনে।
মাসেকের পর তেমনি বিকালে ছোট প্রজাপতি এ কি
বসিয়াছে পায়ে খাসা সুন্দর—মুগ্ধ হইনু দেখি।

ফুল নই আমি সকলেই জানে, আমিও তা বেশ জানি,
কেন মোর পায়ে আসিয়া বসিল হেন সুন্দর প্রাণী?
মনে হল সেই শুঁয়াপোকাটিই এই নব দেহ ধরি
বিচিত্র বেশ দেখাতে এসেছে পুরাতন স্নেহ স্মরি।

লভি অপূর্ব পরিবর্তন—জীবন আকাঙ্ক্ষিত,
ভোলে নাই মোরে, ভাবিয়াছে আমি দেখিয়া হইব প্রীত।
সকলে হয়তো হাসিয়া উঠিবে শুনিয়া আমার কথা,
হোক কীট, গড়া সেও বিধাতার,—সে জানে কৃতজ্ঞতা।

একই জীবনে কি দিব্য দেহ করেছে সে দেখ লাভ,
ফুলের রাজ্যে হইয়াছে যেন পরীর আবির্ভাব!
ক্ষুদ্র তুচ্ছ পোকাটিরও প্রতি বিধির করুণা হেন,
একই জীবনে দিব্য জীবন মানুষ পাবে না কেন?

ভ্রমান্ধ

উপলের মাঝে মানিক পড়িয়া থাকে—
তাহারা তাহাকে ঠেলা মারে অবিরত।
শামুক-গুগলি ঝিনুকে দাবায়ে রাখে,
মুক্তা-ভরা সে—মূল্য তাহার কত!

পাখিরা গরুড়ে পক্ষী বলেই জানে,
বোঝে না, কতই শক্তি মহিমা তার;
শ্যাওড়াও হাসে চাহি চন্দন পানে,
ভাবে, গন্ধের গৌরব কিবা আর।

কবীরের সাথে তাঁতিরা যাইত হাটে,
কবীরে তাহারা সকলে ভাবিত দীন ;
বুননির গুণে তাদের গামছা কাটে,
বুঝে না কিসে যে কবীরের চেয়ে হীন।

রামপ্রসাদের তবিলদারির কাজ
বহুজনে আরো ভালো পারে তাহা বুঝি।
করে দেখ দেখি হিসাব-নিকাশ আজ
কী সে রেখে গেছে কালের তবিলে পুঁজি।

ধরণীর মীন কূর্ম ও বরাহেরা
যতই দেখুক ঘুরে ফিরে চারিপাশে,
চিনিতে নারিবে হরিরে কখনো এরা
হরি তাহাদের রূপ ধরে যদি আসে।

বিয়ের ফর্দ

বাক্সে পেলাম আমার বাবার বাবার বিয়ের ফর্দখানা—
পাঁচটাকা মণ সীতাভোগ আর চারটাকা মণ মিহিদানা—
বরের টোপর চৌদ্দ আনা, হয়তো সেটা পড়েই পাওয়া,
নেইকো জুঁয়ের মালার কথা, মত্ত নিয়েই খাওয়া-দাওয়া।
দুই টাকা মন 'বাসমতি' চাল এখন যাহা পাইনে খুঁজি—
ঠাকুরদাদার বিয়ের সময় শায়েস্তা খাঁর আমল বুঝি!
সুলভ বড় মৎস্য তখন, ওজন পাকার চেয়েও পাকা,
এমন বিরাট বৃহৎ ব্যাপার, খরচ সাড়ে সাত-শ টাকা।

২

'রসান চৌকি' বিষ্ণুপুরের বাংলাজোড়া যাহার খ্যাতি—
ঠাকুরদাদার হিংসা আজি করছে বসে তাহার নাতি।
'সিউড়ি' হতে রায়বেঁশে দল, 'নারানপুরে'র দগড় বাঁশি;
'নিগন' তাহার ঢোল পাঠাল, আতসবাজি 'বনকাপাসী'।
ভারে ভারে ক্ষীর ছানা আর 'ধেনো'র গোয়াল দই পাঠালে।
উজ্জ্বল রাতি 'পালিশগাঁ'য়ের ফুলছড়ি ও রঙ্‌মশালে।
দশটি হাজার পদ্মপাতা, দুঃখ নাহি পাইনি যেতে,
হৃদয় আমার উঠছে মেতে অতীত দিনের আনন্দেতে।

৩

'বালুচর'-এর রঙিন চেলি গায়ে যেন জ্বলছে হীরা,
ময়ূরকণ্ঠি ডাকশাইটা বুনেই দিলে 'বাঘডিগিরা'।
বর্ধমানের রাজার এবং অগ্রদ্বীপের দুইটা হাতি
এঁকে সিঁন্দুর-তিলক ভালে হয়েছিল বিয়ের সাথী।
সঙ্গে গেল পাঁচটা ঘোড়া একেবারে সবার সেরা,
কোম্পানির এক তঙ্কা করে ইনাম পেলে মাহুতেরা।
গরুর গাড়ি পঁচিশখানা, বাকি সবাই চরণ-যানে,
শিবিকা মোট তিনখানা ও ষোলজনায় পালকি টানে।

৪

রঙের খরচ স-সাত আনা কেমন সে রঙ বসেই ভাবি,
হয়তো হবে অতি প্রাচীন 'ম্যাজেন্টা' বা 'খুন খারাবি'।
ফর্দখানি হলুদ মাখা, হরফগুলি স্পষ্ট অতি ;
ঠাকুরদাদার বাবার উপর প্রসন্ন খুব প্রজাপতি।
সেই সে দিনের হুলুধ্বনি শুনছি আমি কাব্য লিখে,
দেখছি আমি ধরতে কুলো ঠাকুরমায়ের শাশুড়িকে।
নিতবর হবার ইচ্ছা যে হয়, হাসিমুখে পালকি চড়ে,
হয়নি সেটা, হবার তো নয়, জন্মেছি যে অনেক পরে।

সুদূর বান্ধবী

তুমি যে আমার প্রপিতামহের বৃদ্ধা প্রপিতামহী,
দাও বর দেবী—আমি তোমাদের প্রণয় কাহিনী কহি।
অনেক দিনের কথা
ক্ষমিয়ো প্রগল্‌ভতা
আমি দেখিয়াছি তোমাদের প্রেম ফুলছাবি হয়ে রহি।

যে বাটায় তুমি সাজিয়াছ পান,—গৃহেতে রয়েছে আজও
সে-বাটারই পান আমি যে চিবাই তুমি কি দাঁড়ায়ে আছ?
অধরে মধুর হাসি,
সরে এস ভালোবাসি,
আমার প্রিয়ার হাতে হাত দিয়ে মোর ল্যাগি পান সাজো।

রয়েছে তোমার আতরদানিটি, তোমারে কেমনে ভুলি?
সোহাগ পরশ দিল তারে তব চম্পক-অঙ্গুলি।
তোমার নীলাম্বরী
ফুলে ফুলে দিল ভরি,
সৌরভে তার আসিত নিকটে ভোমরা ও বুলবুলি।

নাসায় বেশর, সীমন্তে 'সিঁথি', সোনার ঝালর তাহে,
মিহি কাশ্মীরী শাল যে শোভিত গরবিনী তব গায়ে।
কটিতে চন্দ্রহার
কি বাহার ছিল তার,
অশোক ফুটায়ে চলে যেতে তুমি পাইজোর মল পায়ে।

চারু কর্ণেতে শিরীষ পরিতে, অলকেতে কুরুবক,
লোধ্র পরাগে যক্ষবধূ কি সাজিতে হইত সখ?
নয়ন কাজল দিতে
হাসে মেঘে বিজলিতে,
ময়ূরকণ্ঠি কাঁচুলি করিত দীপালোকে ঝকমক।

আলতা-রাঙানো পদে কাদাপথে যেতে যবে সরসীতে—
প্রিয় ননদিকে হয়তো বলিতে হাসি কোলে তুলি নিতে।
সে রসিকতার ধারা
এখনো হয়নি হারা,
অমর হয়েছে বাদল বাতাসে গ্রামের রীতে ও গীতে।

চঞ্চল তব চাহনির দাম ছিলনাকো বড় কম—
ঘুরি বার-বার নিকটে আসিত স্বামী তব প্রিয়তম।
লভিতে মনের মতো
উপঢৌকন কত,
আজিও জড়োয়া ফুল-ঝুমকা যে হয়ে আছে অনুপম।

কলসি কক্ষে সলিল আনিতে—সন্দেহ নাই তিল,
কুম্ভে করিত স্বর্ণকুম্ভ নভের সোনালি নীল।
গড়া মেহগিনী কাঠে
তোমার সখের খাটে
আমরাও বসি—তোমার সঙ্গে সখীর রয়েছে মিল।

সে জাঁতি রয়েছে বিবাহে যা ছিল তোমার বরের করে
তোমার হাতের কাজল-লতা তো দেখিতে পাইনে ঘরে।
তোমার বরণ-থালা
ভাণ্ডার করে আলা,
তব সোনাহাতে কষ লেগে আছে, সোনা রঙ ঝরে পড়ে।

কপোত হইয়া কোলে উঠিয়াছি, স্মর-শিশু হয়ে মনে,
শিখী হয়ে তব সমুখে নেচেছি কঙ্কণ নিক্কণে।
ছিনু আমি দিবানিশি
তব লাবণ্যে মিশি,
এসেছি তোমার সোনার স্বপনে এসেছি সঙ্গোপনে।

মুগ্ধ চকোরী সুদূর সুধার লভিয়াছ আস্বাদ
কিরণ ধরিয়া চন্দ্রলোকেতে যাওয়াই তোমার সাধ।

হৃদি-দর্পণ ’পরে
হেরিতে বংশধরে,
তোমার মনের কামনা যে আমি অনাগত আহ্লাদ।

হয় নাই দেখা, তোমার লাগিয়া উড়ু উড়ু করে মন,
সুরলোক হতে লহ গো আমার বেতার নিমন্ত্রণ।
তোমার ঝিনুকখানি,
প্রেয়সীকে দাও আনি,
দাও বুকভরা আশিসের সাথে মুখভরা চুম্বন।

রিক্‌শ

টুং টুং ঘণ্টা, যান আগুয়ান
রাজপথ দিয়ে জোরে টানছে জোয়ান।
টুকটুকে লাল তার সুখাসন ভাই,
হিন্দোলা নয়, হয় দু-জনার ঠাঁই।
সন্‌ সন্‌ ধায় ট্রাম মোটরের দল,
রিক্‌শ এ টুনটুনি, তাহারা ঈগল।
ফায়ার বিগ্রেড ছোটে নাইকো গুজার,
এ যেন রে জেলে-ডিঙি, তাহারা ক্রুজার।

ভালোবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটি,
গ্রান্ডিফ্লোরার মাঝে দীন দোপাটি।
নয় হীরা জহরত, উঁচু নয় শির,
চুমকি সে যেন ছোট রঙিন পুঁতির।
গতির সে মেঘনা কি নয় দামোদর,
সে যেন রে অতি ছোট গিরি-নির্ঝর।
যেতে নারে দুর্বল দেহ তার ক্ষীণ
মরু হতে মেরু আর পেরু হতে চীন।

রাজ্যের যান মহাকাব্য না হোক,
স্নিগ্ধ সে সুন্দর উদ্ভট শ্লোক।
ধ্রুপদ খেয়াল নয়, নাই মান তার,
তাইরে নাইরে যেন দুইটি কথার।
পজ্ঝটিকা সে নয়, নয় ত্রিষ্টুভ,
নব লঘু দ্বিপদীর ছন্দের রূপ।
নয় সে তো হঠযোগী, নাই যোগবল,
সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল।

পাঠশালায়

আসিয়াছে বুঁচুবাবু পাঠশালে পড়িতে,
মুখে বলে 'ক' 'খ' আর লিখে তাহা খড়িতে।
কী করুণা কাতরতা মাখা তার স্বরে রে,
বিশ্বের ব্যথা যেন একসাথে ঝরে রে।
হাসিছেন পণ্ডিত খুশি তারে রাখিতে।
গোমুখীর ধারা তবু উঁকি মারে আঁখিতে।
কণ্ঠের সুরে উঠে কী কাকুতি ছাপিয়া;
সারারাত ডেকে যেন ক্লান্ত এ পাপিয়া।
এ যে দেখি রাঙা হয়ে উঠিয়াছে গণ্ড,
বিষপান করিছেন যেন নীলকণ্ঠ।
বাণীপদ কোকনদে—বল দেখি তোমরা—
এত কি কোমল সুরে গুঞ্জরে ভোমরা?
করেছিল এমনি কী—বসে দেখি রঙ্গে—
ত্রস্ত অগস্ত্যকে সাগর তরঙ্গে?
কাঁদিছে—এবং আহা কাঁদাইছে সবারে—
বালক বাসব দেখি উচ্চৈঃশ্রবারে।

কে

দুখের নিবিড় অন্ধকারে আশার আলো কে জ্বালে ভাই?
কে জ্বালে ভাই আশার আলো আপন মনে ভাবছি যে তাই।
ভাবছি আমি অবাক হয়ে,
হৃদয় ভরে কি বিস্ময়ে।
সব আঘাতের অন্তরালে এ কার পরশ অন্তরে পাই।

শক্তিশেলের সঙ্গে যে পাই কাহার পরশ সঞ্জীবনী।
মর্মে পরশ সঞ্জীবনী, কর্ণে অভয় মঞ্জুবাণী।
বারেক কেবল হাত বুলায়ে
সকল বেদন দেয় ভুলায়ে,
দীনের চোখের জল রোধিতে নিরঞ্জনের অঞ্জন চাই।

দারুণ জতুগৃহের তলে কে কেটে দেয় সুড়ঙ্গ হে।
শার্দুলে সে এক ধমকে করতে পারে কুরঙ্গ হে।

হিংস্র নিঠুর বাজপাখিরে
করে কপোত সেই ডাকি রে,
অনলকে হায় জল করে দেয়, কিছুই তাহার অসাধ্য নাই।

ইন্দ্রপ্রস্থ দেয় রচে সে বিরাটপুরের বন্দিশালায়,
সাধ্য কাহার বুঝতে পারে কোথায় কী সে ফন্দি চালায়।
বিষতরুতে পীযূষ ফলায়,
শিশির নীরে ভূধর গলায়,
করছে কী সে তলায় তলায় ঠিক নাই তার ঠিকানা ঠাঁই।

বুঝতে নারি কখন আসে কোন্ গরুড়ে কোন্ রথে সে,
চোখের পানিপথ দিয়ে হায় তপ্ত মনের বনপথে সে।
যে পথে আর নাইকো আশা
সেই পথে হয় তাহার আসা
পাশ কাটিয়ে সামনে আসে ব্যাকুল হয়ে যে পথে ধাই।

চড়ুইভাতি

পারের ঘাটের পান্থশালায় আমরা করি চড়ুইভাতি,
জুটলাম এসে, ছড়িয়ে ছিলাম শৈশবের সব সুখের সাথী।
কতই দিকে কতই কাজে
গেল দিবস বিফল বাজে,
আঁচল ভরে কুড়িয়ে নিলাম কেউ বা খ্যাতি কেউ অখ্যাতি।

বেরিয়েছিলাম রঙিন ভোরে হাঘরেদের মতন সবে,
ভাবিনি যে মিলন আবার হেথায় বিদায়-মহোৎসবে।
কতই ভীতি, কতই স্মৃতি,
কতই প্রীতি, কতই গীতি,
সঙ্গে করে এলাম নিয়ে অশ্রু-হাসির মাল্য গাঁথি।

আজকে করি চড়ুইভাতি, চড়ুইভাতি দুখের সুখের,
হাসিতে সেই বাঁশির আওয়াজ বদলে যাওয়া চেনা মুখের।
নাচত যারা নাচে না আর,
শুধু আছে ভঙ্গিটি তার,
ভাঙা বুকের ফাটলেতে উঁকি মারে যূথি জাতি।

ঘোরাই লাটিম, বাজাই বাঁশি, মেলার ফেরত সবাই মোরা
কেউ-বা পেলাম মাটির হাতি কেউ-বা পেলাম কাঠের ঘোড়া।
ধিন্‌তা ধিনা ধিন্‌তা ধিনা,
চিন্তা মোরা আর রাখি না,
আসবে খেয়ার নৌকা আসুক আমরা পাশার ছক তো পাতি।

বুলবুলি ঝাঁক ফিরবে নীড়ে—ধুলা ঝাড়ে পাখনা গুচ্ছায়,
চঞ্চু যে আর দেয় না ঠোকর টুকটুকে লাল তেলাকুচায়।
আবার ভোরের রেশটি নিয়া
উঠছে সবাই ঝঙ্কারিয়া,
ভয় কিছু নাই ডুবুক রবি, সম্মুখে পূর্ণিমা রাতি।

কায়া থেকে আমরা এখন ছায়ার দিকে যাচ্ছি ফিরে,
কথার মানুষ উপকথায়, ক্ষীরের পুতুল মিশব নীরে।
ফুল থেকে যাই সৌরভেতে
বিন্দুব্যথা নাই তো এতে,
জীবন করি সংগীতে শেষ—মরালকুলের আমরা জ্ঞাতি।

কবির সুখ

কবিতা লিখিয়া পাইনি অর্থ, পাই নাই কোন খ্যাতি ভাই—
হয়েছি স্বপ্ন বিলাসী, অলস—অনুযোগ দিবারাতি তাই।
হিসাবী বন্ধু, ভুল করিয়াছ, ভুল বুঝিয়াছ আমাকে,
ধন-মান লাগি কবিতা লিখি না, মরি আমি সেই দেমাকে।
ফল পেতে হলে চাষ করিতাম, ব্যবসা চাহিলে অর্থ,
মৎস্য ধরিতে জাল ফেলা চাই, আকাশে চাওয়া যে ব্যর্থ!

অনটন দেয় আঘাত নিত্য, মচকাই, তবু ভাঙি না,
সাঁজের প্রদীপে তেল নাই মোর, ফুলে আলো করে আঙিনা।
আঁধারে যখন কাটিতে চায় না একা বসে বড় ভাবি রে,
অরুণ আমায় এসে উঁকি দেয়, আকাশ ভরে যে আবিরে।
ধিক্কার পাই নিন্দাও পাই নানা মুখে নানা ভাষাতে,
সব শুঁয়াপোকা প্রজাপতি হবে আমি থাকি সেই আশাতে।

কোন্ ধন-মান পাইবার লাগি ঝঙ্কারে পিক পাপিয়া?
কী পায় সাধুরা গিরি-গহ্বরে কঠোর জীবন যাপিয়া?

চিন্তামণির ধনে ধনী যারা তারা কি মুক্তামণি চায়?
বিস্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে নিতি প্রতি অনু-কণিকায়।
আমি সে সুখের সেই তৃপ্তির আর সে প্রেমের ভিখারি
আলোক মাগি যে আতপ মাগি যে সেই হোমানল শিখারই।

ভুবন আমার অমৃতসিক্ত শুধু আনন্দ আলোকের,
ক্ষীর নবনীর অবনী সে মোর, আমার ধরণী বালকের
সোনার নূপুর গুঞ্জরে যেথা, বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরি,
সব দুখ মোর সুখ মনে হয়, সব ব্যথা যাই পাশরি।
লিখি হিজিবিজি, কী পাই তাহাতে? বন্ধু, কহিব কিবা আর
সেই সুখ পাই, রামধনু আঁকি উপজে যে সুখ বিধাতার।

অসমাপ্ত

কত গান গাই কত কথা বলি কী বলিতে বাকি থাকে,
আমি যারে চাই সে দূরায়মান কেমনে ধরিব তাকে?
পঙ্ক স্বপ্ন দেখে কমলের, শুক্তি মুক্তা চায়,
পাথর কাঁদিছে পরশ-পাথর হবার আকাঙ্ক্ষায়।
প্রতি পদার্থে অপার্থিবের রহিয়াছে পরিবেশ
অচিন্তনীয় সম্ভাবনার হেরি নিতি উন্মেষ
        প্রকাশ করিতে চাই—
অফুরন্তকে ফুরায়ে বলার সাধ্য আমার নাই।

গঠন কিছুরি করে নাই শেষ স্বর্গীয় ভাস্কর,
সব হতে চায় নিত্য-সূক্ষ্ম আরো বেশি সুন্দর।
যেটুকু আভাস ইঙ্গিত পাই তাই ভাবি যাব কয়ে,
পরে দেখি আরো রূপের জগৎ পড়িছে ব্যক্ত হয়ে।
যে রূপে আমার বুক ভরে ওঠে না বলে কেমনে থাকি?
যা বলেছি তাহা শেষ কথা নহে, অনেক রয়েছে বাকি।
        বিস্মিত হয়ে হেরি—
মোর চন্দ্রের পূর্ণচন্দ্র হতে যে রয়েছে দেরি।

ভাষাও পায়নি পূর্ণ শক্তি, দৈন্য ঘোচেনি তার,
প্রকাশ করিতে পারে না মনের নূতন আবিষ্কার।
অনাগত আসি সুমুখে দাঁড়ায়, দৃষ্টি পরিধি বাড়ে,
দেখি অকূলেরও রহিয়াছে কূল পেতে পারা যায় তারে।

পরশমণিও পরশে না যাঁরা হেরি তাঁহাদের দেশ
পলে পলে যাহা নূতন, তাহা কি বলে করা যায় শেষ?
মুখে না বচন স্ফুরে—
বাঁশরি কেবল আগাইয়া ডাকে ভুবন-ভোলানো সুরে।

মুগ্ধ করিছে, ভুলাইছে মোরে অমৃতের মরীচিকা,—
দেবতার নব-রূপ প্রকাশিছে আরতির দীপশিখা।
কমলের পর কমলেতে পূজা হয় না তো সমাপন,
দেখি আরো এক নীল কমলের রহিয়াছে প্রয়োজন।
ইন্দীবর তো নহে মোর আঁখি পদে দেব উপাড়িয়া,
চেয়ে থাকি শুধু রাঙাপদ পানে রসে-ভরা আঁখি নিয়া।
শেষ হয়নাকো কথা—
অফুরন্ত যে জীবন, রবেই অসমাপ্তির ব্যথা।

নৃত্য

নৃত্য ও তো পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন—
আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, আকর্ষণ।
সোনা মেঘ ওই, করছে সোনা বৃষ্টি,
চৌদিকে তার ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি,
রূপ চাহিছে অরূপকে যে করতে আলিঙ্গন।
ভাবের অভিব্যক্তি শুধু নয়,
সুন্দরে যে পূজা ওতেই হয়;
সর্ব অঙ্গ প্রেমাস্পদে করছে নিমন্ত্রণ।

স্বর্ণ গিরির অঙ্গ বেয়ে ঝরছে রে নির্ঝর,
উঠছে ফুটে হাজার নাগেশ্বর।
মানস-সরের দুলছে কোমল দল,
সুবর্ণ রাজহংসী কাঁপায় জল,
কাশ্মীরী জাফ্রানের ক্ষেতে লাগছে মৃদু ঝড়।
শিল্পী ছবি আঁকছে অজন্তায়,
বসায় মণি তাজমহলের গায়,
যক্ষ-বধূর নিঃশ্বাসে যে মেঘ-মেদুর অম্বর।

করছে চারু চঞ্চলতা সৃষ্টি কাব্যলোক,
ফুটছে শিরীষ কর্ণিকার অশোক।

ইন্দ্রবজ্রা মন্দাক্রান্তা সাথ,
মিশছে এসে ভুজঙ্গ-প্রয়াত,
ইঙ্গিতে ও ভঙ্গিতে তার সংগীত এবং শ্লোক।
দেব ও দানব, মানব, পশুপাখি
নৃত্যে তাদের চিহ্ন গেছে রাখি,
সর্বযুগের কৃষ্টি সাথে আছে ইহার যোগ।

নৃত্যে রাজে শিল্পী মনের গভীর সংবেদন—
ও রৌদ্রে রয় জল-ভরা শ্রাবণ।
রূপ যে তাহার সোনালি বিদ্যুৎ
দিক-দিগন্তে পাঠায় কবে দূত,
হস্তে তাদের অভিজ্ঞান আর প্রেমের নিদর্শন।
অঙ্গে অঙ্গে অনন্ত পিয়াসা,
আলোর পাখি খুঁজছে যেন বাসা,
গ্রহ-তারায় লাগছে লঘু পাখার আন্দোলন।

মহাপৃথিবী

হে মহাপৃথিবী, কত দিবা তব প্রখর রৌদ্রময়ী
যেপেছি কাতরে 'পরান-পোড়ানি' সহি।
কতই ভয়াল ঝঞ্ঝা মুখর অমাবস্যার রাত
কাটায়েছি করি নীরব অশ্রুপাত।
এল বিভীষিকা জড়ীভূত করি মন,
লোভনীয় হয়ে এল হীন প্রলোভন,
সব দূরে গেছে, যাতনার কথা নিভৃতে তোমারে কহি।

২

কত নির্মম শাণিত বচন—তীক্ষ্ণ ছুরিকা সম—
কত প্রিয়জন হেনেছে বক্ষে মম।
কত অপবাদ, কত নিদারুণ অলীক নিন্দাভার
পরাল কণ্ঠে খর কণ্টক-হার।
অচিন্তনীয় বিশ্বাসঘাতকতা,
এসেছে মর্মভেদী সে কৃতঘ্নতা,
কিন্তু তারাই জীবন-যুদ্ধে করেছে আমারে জয়ী।

৩

স্বভাবকৃপণা বিনয়বধিরা, তবু যে তোমারি দান
সন্দেহ মোর করিয়াছে অবসান।
দুঃখ যা দাও বুঝিনে কী তাহা, দুখ বলে হয় ভুল-
তোমার কাঁটাই সহসা যে হয় ফুল।
শব-সাধনার জীবন আমার ধরা,—
শবাসনা সাথে হয়ে গেছে বোঝাপড়া,
কৃপা লভিয়াছি, বিড়ম্বনায় আর ক্রীড়নক নহি।

৪

সামান্য নহ তুমি ভাবময়ী, তুমি যে অতুলনীয়া—
মাটি হয়ে থাক সরস সদয় হিয়া।
হেরেছি তোমার চিন্ময়ী-রূপ আমি দু-নয়ন ভরি,
ভুবন তুমিই, তুমি ভুবনেশ্বরী।
তুমি মাটি বট, দেবতা তোমাতে হয়,
রূপ আর ভাবে চলিতেছে বিনিময়,
তুমিই যোড়শ-মাতৃকা দেবী তুমি মহাকালী অয়ি।

কবিতার দুঃখ

বটি মানুষের সুখ-দুখ-ভাগী, বাস করি এক ঘরে,
কিন্তু আমি তো ভুগিতে পারিনে প্লীহা কি কম্পজ্বরে?
দেখি তাহাদের অন্নকষ্ট—নানা দিকে ক্ষতি-ক্ষয়—
কিন্তু তাদের দৈনন্দিন দিই না তো পরিচয়।
তাতে কী সার্থকতা—
হাঁপাইয়া আমি যদি তাহাদের কহি হাঁপানির কথা?

২

দাবানলে মৃগ-মড়কের কথা বলেনাকো মৃগনাভি,
মুক্তা করে না লবণ জলের প্রতিনিধিত্ব দাবি;
রৌদ্রও আছে, জলকণা আছে, সন্দেহ নাই অণু—
তবু মেঘ নয়, রৌদ্রও নয়, রামধনু—রামধনু।
পঙ্কেতে রহে বোঁটা—
কী দোষ যদি না রহে পঙ্কজে পঙ্কের ছিটা-ফোঁটা?

৩

হীরক রাখে না আবেষ্টনীর কয়লা-কালিমা লেশ,
অলখিত থাকে খনির আঁধার খনি-শ্রমিকের ক্লেশ;
সাপের মাথায় মানিক, তাহারো আনন্দ দিতে সাধ,
সেও দেয়নাকো বিষদংষ্ট্রার গরলের সংবাদ।
শুভ শঙ্খ-স্বন—
শম্বুকদের শুঁড়ের কাহিনী করে না তো নিবেদন।

৪

'চোখ গেল' বলে পাপিয়া ফুকারে, সেটি হয় সংগীত ;
ক্ষুধিত ব্যাঘ্র গর্জন করে, সেটা তার বিপরীত।
অতিক্রম যে করে সংগীত সব যাতনার সীমা,
ছন্দে ও সুরে বাজে তার চির-বাসন্তী পূর্ণিমা।
তিক্ততা রহে দূর—
গীত যে সাগর-উত্থিত সুধা সব তার সুমধুর।

৫

এসেছে দারুণ মন্বন্তর, মানুষ করিবে কি?
লাভ তো কিছুই হবে না করিয়া মনকে হতশ্রী।
সুধাকর নাম না দিয়া চাঁদকে যদি বলা হয় 'খেটে',
পড়িবে কি একমুঠা বেশি ভাত তাতে ক্ষুধিতের পেটে?
কে হবে তাহাতে ধনী—
খুলে লও যদি ধরা-গাত্রের সুষমার আবরণী?

৬

অধিকারী-ভেদ সবেতেই আছে—কী বলিবে মহাজনে
কাশ্মীরী শাল না বুনে শিল্পী 'গামছা'ই যদি বোনে?
যারা 'অজন্তা' 'মাদুরা' গড়েছে খ্যাত যারা চরাচরে
কলা-লক্ষ্মীই কাঁদিবে, তাহারা যদি শুধু ঢেঁকি গড়ে।
বাড়িবে বিড়ম্বন—
সকল লেখনী লাঙল হইলে উপবাসী রবে মন।

৭

ভেব না নেহাত উদাসীন আমি, নাইকো সহানুভূতি,
যদি না ফসল ফলাইতে পারি, যোগাতে না পারি ধুতি।
আমি তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনার কথা কই,
সুরপুরে তাহা পাঠাবার শুধু যোগ্য করিয়া লই।

বুঝিতে কোরো না ভুল—
বাণী-অর্চনা হয়নাকো দিয়ে গোবরের বর্তুল।

৮

যুগ-উপযোগী হতে কহ মোরে, তাতে মোর রুচি নাই,
সব দেশ কাল জাতির আমি যে মর্যাদা পেতে চাই।
ধনিক বণিক শ্রমিক ক্ষণিক কারো প্রীতিকামী নহি,
আমি জগতের যজ্ঞের হবি দেবতার তরে বহি।
আর কিছু নাহি পারি—
আমি তোমাদিকে কবি আনন্দ অমৃতের অধিকারী।

কেমন আছি

কাটছে দারুণ শীতের রাতি কষ্টে ছিটে-বেড়ার ঘরে,
হৃষিকেশের ঝারিতে সব সাধুর বসত মনে পড়ে;
সাধুর মতো মন পেলে তো? এ পর্ণবাস কাম্য বড়—
মন রে আমার হিমের রাতে অমরনাথের দেউল গড়।
শীত তো শুধু ভোগায়নাকো আনে কত ত্যাগের কথা,
'সুরভি' আশ্রমের সুধা, 'ধরাদ্রোণে'র পবিত্রতা।
নিশির শেষে ধোয়ায় অজয়, সিঁদুর মেখে ওঠেন রবি—
আমি যে এই পল্লীবাসে কল্পবাসের তৃপ্তি লভি।

শুনেছিলাম ভূমণ্ডলে স্থল বেশি নাই, তিন ভাগই জল,
দেখতে পেলাম ন-ভাগ সলিল, কোনখানেতে দাঁড়াই মা বল্?
বন্যা নিলে অনেক কিছু নিত আরো অধিক পেলে—
কিন্তু প্রচুর গান দিয়েছে বিহগগণের কণ্ঠে ঢেলে।
ভোর থেকে জোর জমায় আসর কাঁসর বাজায় লোচন-পাটে,
যোগ দিয়েছে কোকিল এবং টাক্‌সোনাও সে কনসার্টে।
মাধবীতে ফুলের স্তবক—অজস্রতা চক্ষে পড়ে—
দৈন্য এবং দরিদ্রতা যা দেখি তা নরের ঘরে।
শীত পড়েছে—শীত বেড়েছে—তবু দেখি সরিয়ে শীতে
দিচ্ছে উঁকি শ্যামল শাখায় আমের কনক-মঞ্জরিতে।
বাল্যে ডাকা সে চাঁদ সাঁজে মোর ললাটে পরায় টিকা,
বিরাজ করেন কুটির ঘিরে বিশাল 'কেদার' 'বদরিকা'।
কুবের শুধান 'রত্নরাজি এলাম দিতে নেবেন কি গো?'

আমি বলি, 'যান ফিরে যান ও সব রাখার ঠাঁই নাহিকো'।
পেয়েছি যা তাহাই বেশি—আমি পাবার যোগ্য যাহা—
জুঁইয়ের বুকে ডাঁশের মধু কেমন করে ধরবে তাহা!
রাজপ্রাসাদে দিন কেটেছে, কেটেছে রাত তরুর তলে;
কোথায় বেশি ভালো ছিলাম? শেষই ভালো মন যে বলে।
দেয় না বাধা গ্রীষ্ম-আতপ, অতি দারুণ বর্ষা শীতে—
ভুলায় মোরে—ভোলেনি যে পাখির গায়ে পালক দিতে।
দুঃখ দিলে আমায় প্রচুর, যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা—
শক্তি এবং সান্ত্বনাও দিয়েছে যেই মহামনা।
অভাব বহু নীরব রহি, চাইতে আমার লজ্জা করে
মহামায়ার স্তন্যধারা লেগে আছে এই অধরে।
কথাতে আর গরল নাহি, কথার ভয়ে হই না ভীত,—
সকল কথাই আমার কাছে হয়েছে আজ কথামৃত।
নিন্দা যাঁরা করেন আমার—করেন না তা বন্ধু বিনে—
ধুলায় ধূসর যে-জন তারে ধুলা দেওয়া স্নেহের চিনে।
যাঁরা করেন সুখ্যাতি মোর, লই না, কারণ বিফল নেওয়া।
ন্যাংটা নাগা সন্ন্যাসীকে দয়াশীলের বসন দেওয়া।
গৌরব আমি রাখব কোথা? ক্ষুদ্র কুলায় আছি টিকে,
রে ভাই, ময়ূরপুচ্ছ দিতে এস না এ টুনটুনিকে।

কাঁপে আমার পর্ণপ্রাসাদ—বৃষ্টি পড়ে, ঝড়ও বহে—
ডাকি, 'কোথায় হে জগদীশ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে।'
সে ডাক তাঁহার কর্ণে পশে, সন্দেহ মোর নাইকো কোনো—
পাই গরুড়ের পাখার বাতাস,—ঘোরে যেন সুদর্শনও।
দর্শনীয়ের দর্শনেতে আনন্দে হই আত্মহারা।
কুশল শুধান যেন এসে যুগের যুগের মহাত্মারা।
পঙ্কজের এ পঙ্কগৃহে—রাতে মরি দিনে বাঁচি;
আমার মা আনন্দময়ী—দুখেই পরম সুখে আছি।

সাধন পথে

প্রয়াগে একদা মেঘাচ্ছন্ন মাঘের প্রাতে—
ধর্মশালায় সাক্ষাৎ এক সাধুর সাথে।
সদা-ছাই-ঢাকা গনগনে তার ধুনির আঁচে—
ঝুলি কাঁথা সাথে খাতা হাতে সাধু বসিয়া আছে।

বাঙালি বটেন—হাসিয়া বলিনু—'খাতায় ও কি?'
সাধু বলিলেন, 'ছবি আঁকি আমি, কবিতা লিখি'।
বৃষ্টি পড়িছে—বাহিরে যাওয়া তো কঠিন জানি—
শুনিতে লাগিনু অগত্যা সেই সাধুর বাণী।

বলিলেন তিনি—গীত রচি, গাহি—কণ্ঠ সাধি,
ভাষা ভাব সুর একেবারে সব রামপ্রসাদী।
বেছে বেছে কথা বসায়েছি বহু ভাবিয়া নিজে—
তবু জমিল না—রয়ে গেছে খুঁত কোথায় কী যে।
রামধনু আমি এঁকেছি—নাহিকো প্রভেদ অণু—
অসীমের সেই লাবণ্য কই পেল না ধনু?
অনিন্দ্য এক গোপাল গড়েছি—তাহাও বৃথা—
লাড়ু খায়নাকো—নাক টিপিলেও কহে না কথা।

সব সাধনার গতিপথ এক—রসিকে বোঝে,
সবাই সুধার সন্ধানী—সবে সিদ্ধি খোঁজে।
বহু রামনাম করেছি—বড়াই কত বা কব—
বাল্মীকি হওয়া ছিল না আমার অসম্ভবও।
ছিনু ধ্যানরত, এত অহিংস, উদারমনা—
হয়তো বা ছিল বুদ্ধ হবার সম্ভাবনা।
কিছুই হল না—কোথা খুঁত? ভাবি দিবস যামী;
পরশ-পাথর না হয়ে পাথর হলাম আমি।

চণ্ডীদাসের মতো পদাবলী লিখেছি দেখো—
ধ্বনি মিলিয়াছে চিন্তামণি তো মিলিলনাকো!
প্রাণ প্রতিষ্ঠা শিখিনি, করেছি গর্ব জমা—
গড়া গেলনাকো তিল তিল রূপে তিলোত্তমা।
সাধনায় মোর সিদ্ধি এল না—স্পর্ধা ভাবো—
রামপ্রসাদের প্রসাদ পাইনে—দেবীকে পাব?
শ্মশানে 'মা' বলে রজনী গোঙানু, কাঁদিনু এত—
ক্ষেপাই হলাম—বামাক্ষেপা কই হলাম না তো?

তাতল সাগর-সৈকতে পুড়ে ঝিনুক মল—
স্বাতীর বিন্দু বারি বিনা সব বিফল হল।
রূপ ও রসের দধি পাতি নিতি—বুঝলে কিনা—
কিছুতেই দধি জমে না কৃপার 'সাজন' বিনা।
জড় জড়ই থাকে, ভাব আসেনাকো বস্তু হয়ে,
রূপে অপরূপ প্রকাশ পায় না—কী হবে লয়ে?

সর্বসিত সে শিব আসিল না—তুষারে শীতে,
সুদূর সুরভি এল না আমার কস্তুরীতে।

তবু তপ করি, কেন আঁকি লিখি, শুনিবে গুণী?
গঙ্গা আসেনি—আমি পাই তার কলধ্বনি।
শ্যামা না আসুন—চন্দ্র ভালীর চাঁদের আলো
চঞ্চল এই তাপিত সুতের চোখ জুড়াল।
তরণী ডাঙায়—আছি জোয়ারের প্রতীক্ষাতে—
হাল ঠিক রাখি, দাঁড় বাঁধি, পাই শান্তি তাতে।
পরিপূর্ণতা আসিছে—চলুক এ টানা-বোনা—
মন বলে মোর কাঠের সেঁউতি হবেই সোনা।

ভাঙন

ভাঙল লুকোচুরির খেলা শ্যামল বাগান শুকিয়েছে,
'দাণ্ডা-গুলি'র হিসাব নিকাশ দু-দণ্ডে সব চুকিয়েছে।
'ঝুল ঝাপ্পুর' খেলত যারা দুলত যারা হিন্দোলায়,—
'কু' দিয়ে সব বাল্য সখা কোথায় কে আজ লুকিয়েছে।

'বাঘবন্দী'র ঘরটি কেহ ঘুটিং দিয়ে আঁকছিল,
'দশ-পঁচিশে'র ছকটি পাতা রঙেব গুটি পাকছিল,
হঠাৎ ধুলোট জমাট মেলায় ভাঙল খেলা মাঝখানে,
কেউ জানে না—কোথায় তাদের বনভোজনের ডাক ছিল।

প্রীতির বাঁধে ধরল ভাঙন জল বাড়িছে চারদিকে।
ফুল খসেছে ঠাসবুনানি গাবের ফুলের হার থেকে।
ঝড় লেগেছে ফুল-ছড়িতে শোভার থাকা যায় ভেঙে—
পড়ল যে চিড় বুকের মাঝে কোন্ প্রলেপে সারবে কে?

করলে সোনার তরীর বহর ছন্নছাড়া কোন্ ঝড়ে।
খোপছাড়া আজ কোন্ সে নিঠুর করলে কপোতপুঞ্জেরে?
দলহারা আজ পদ্মটাটি অশ্রুসায়র মাঝখানে—
শূন্য-মধু মৌচাকে আজ মন-ভোমরা গুঞ্জরে।

বনবাসে

বনবাস মোর শেষ হবে কবে? জান যদি কেহ, কহ রে!
চৌদ্দবরষ রহেছি যে আমি মোর গ্রাম ছাড়ি শহরে।
কাননে রামের বহু সুখ ছিল, ছিল ফুলতরু লতিকা
স্বচ্ছসলিলা ছিল গোদাবরী সকল বেদনাহারিকা।
এখানে তো নাই বনমর্মর বনবিহগের সাড়াটি,
অগাধ জনের বদলে পেয়েছি ক্ষীণবল জনধারাটি।
কোথা আমগাছে ঝুপ ঝাল্লুর কোথা বটগাছে ঝুলব?
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকূল যেথা বুনো ফুল তুলব।

কোথা কস্‌কসে কাঁকুরের ক্ষেত ছোলা মটরের ভুঁই মা
রাজা হব কোথা, বিমাতার মতো বনে পাঠাইলি তুই মা?
যাব মিথিলায় মহাসমারোহে কোথা হরধনু টুটতে,
তুই মা আমারে বনে পাঠাইলি মারীচের পিছু ছুটতে।
হাঁফ ছাড়িবার সময় নাহি মা জঠরে নাহি মা অন্ন,
দিশেহারা হয়ে ছুটেছি কেবল স্বর্ণমৃগের জন্য।
আর কি তোমার কোমল কোলে মা পাবনাকো আমি ফিরতে-
শৈশব সুখস্বর্গ আমার সরযূর তীর-তীর্থে।

স্মৃতিডোর

যেখানেই যাই ফাঁকা ঠাঁই নাই পাইনাকো নিরিবিলি,
চারিদিকে মোর সুদূর স্মৃতির ঝুলিতেছে ঝিলিমিলি।
ক্ষীণ হয়ে আসে জীবনের আলো সোনা যা তা কেড়ে নিল
সোনালি রঙের ছোপে ছোপে কেন হৃদয় ভরিয়া দিল?
কারণ খুঁজে না পাই—
কে নিভানো আতশবাজিতে নিতি করে রোশনাই?

২

সব চেনা পথে কত চেনা মুখ, দূরগতদের ভিড়।
পথ তরুশাখে উড়ো দিনগুলি বাঁধিয়াছে যেন নীড়।
কত শরাহত কপোতের ব্যথা শ্যেনের তীক্ষ্ণরব,
শুষ্ক তৃণের মঞ্জরিগুলি পর্যুৎসুকী মন যেন জেগে উঠে সব।
স্মরে কত গত মহাসমারোহ নীরব নিষ্ক্রমণ।

৩

তীব্র ব্যথাকে কেমনে যে কাল সহনীয় করে ভাবি,
প্রিয় হরিণের বক্ষ চিরিয়া এনে দেয় মৃগনাভি।
জীর্ণ ছিন্ন হিন্দোলে দেয় গত ঝুলনের দোল,
হাজার ছিদ্র কলসিতে তোলে যমুনার কল্লোল।
আমি চেয়ে দেখি ফিরে
কত বিজয়ার প্রতিমা ভাসিছে আমাব নয়ননীরে।

৪

সরায়ে আমার ভাস্করে আজ বসেছে চিত্রকর।
ভূলোকের চেয়ে ছায়ালোক মোর হতেছে বৃহত্তর।
পাই যক্ষের বক্ষের ধন সেইখানে মাটি খুঁড়ি,
প্রতি রোহিতের কাছে সে হারানো হীরকের অঙ্গুরি।
চিনি না সে মধুকরে—
কাঁটার ফুলের মধুতে যে মোর খালি মৌচাক ভরে।

৫

নয়নে যা দেখি তাহা বেশি নয়, পুরাতন এই ক্ষিতি
কতই যুগের মাধুরী ইহাতে কত জনমের প্রীতি।
অসুন্দরকে সুন্দর করে করে তোলে মনোলোভা,
ক্ষুদ্র সলিলবিন্দুতে দেয় ইন্দ্রধনুর শোভা।
জানায় আমার প্রাণ,
জন্মান্তর কেবল কয়টা নিশ্বাস ব্যবধান।

৬

জীবনে ধরিয়া বুনিছে যে এই স্মৃতির রেশমিগুটি,
চলে যায় যবে কোথায় সে যায় সব বন্ধন টুটি?
পাখায় তাহার লাগে নাকি কষ বুকে কি রাখে না দাগ
এত দিবসের সুনিবিড় প্রেম সুগভীর অনুরাগ?
সত্য কি পায় ছুটি—
কিংবা আবার ফিরে এসে বোনে এমনি রেশমিগুটি।

ভুল

অনেক সময় ভালোই লাগে ভুল গো,
মহাকালের নয়ন ঢুলু ঢুল গো।
ভুলে বায়স কোকিল পালে,
সুধা ছড়ায় তমাল ডালে,
বসুন্ধরা আনন্দে আকুল গো।

২

ভঙ্গ যতি মহাকবির পদ্যে,
মুক্তা-তোলা তরী সাগর মধ্যে।
নীল আকাশে ফানুস ওঠা
মেরুর দেশে মানুষ জোটা
ফাটল মাঝে হঠাৎ ফোটা ফুল গো।

৩

ভুলটি আহা সব্যসাচীর লক্ষ্যে,
চমক লাগায় বিশ্ববাসীর চক্ষে।
পাগলা ভোলার মধুর ভুলে,
নিঠুর নিষাদ মুক্তি পেলে,
এ ভুল করে হৃদয় বেয়াকুল গো।

৪

সাবিত্রীকে যমের দেওয়া বর গো,
ভুল তো বটে ভুল যে মনোহর গো।
যম রাজাকে দেয় মহিমা
অসীমে দেয় শোভার সীমা,
অকূল মাঝে মোহন উপকূল গো।

৫

ভুল করিয়া তমাল আলিঙ্গন গো
নবীন নীরদ দেখা ক্ষণে ক্ষণ গো।
মহাভাবের আবেশ ফলে
হর্ষে ভাসা নয়ন জলে,
ভুল নহে সে সকল জ্ঞানের মূল গো।

চকোর

চঞ্চল আমি চকোর ক্ষুদ্র পাখি—
দূর প্রান্তর প্রান্তে একাকী থাকি।
পেয়েছি পক্ষ, পেয়েছি চক্ষু, বেড়াই আহার খুঁজি,
এ-দেহ কতই ভঙ্গুর তাহা বুঝি।
হেরি বাবুই-এর খাসা বাসা বোনা শ্যেনের দাপটে ক্রূর,
আহত কপোত করে মোরে ব্যথাতুর।

২

শুনি কোকিলের কুহু ও শ্যামার শিস
কি মধু কণ্ঠ দিয়াছেন জগদীশ!
শিখী-শিখিনীর নৃত্য।
আনন্দে মোর শিহরিয়া ওঠে চিত্ত।
ওই গৌরব উহাদের থাক হেরি হয়ে প্রীতিকামী
আমি যা পেয়েছি তাতেই তুষ্ট আমি।

৩

দীন অধিবাসী আমি বটে ধরণীর,
আকাঙ্ক্ষা মোর আকাশে বেঁধেছে নীড়।
গরুড়ের সাথে মোর জ্ঞাতিত্ব স্মরি আমি অহরহ,
স্বর্গে মর্তে বিচ্ছেদ দুঃসহ।
ভুলে যাই আমি গোটা এ-ভুবন,
ভুলে যাই মোর গৃহ,
গগনের চাঁদ হইয়াছে আত্মীয়।

৪

দিবস-রজনী দুই-ই মোর নিশীথিনী
আমার অরূপ চাঁদকেও আমি চিনি।
তারা গুঁড়া দিয়ে গড়া ছায়াপথ ভুলায় আমার মন,
রাগের ও-পথে পেয়েছি নিমন্ত্রণ।
আমার চন্দ্র কখনো কৃষ্ণ স্বর্ণ বর্ণ কভু
তিনি এক মোর—বহুরূপ তাঁর তবু।

৫

বুঝি তাঁরি কাছে যাবার লাগি এ-পাখা,
কণ্ঠের কাজ কেবল তাঁহাকে ডাকা।
শুধু খড়কুটা কীটপতঙ্গে আর সুখ নাহি পাই।

চাহিনাকো তাহা, যাতে সুধাকণা নাই।
তোমরাও এস ডাকি সবাকারে, বলি আমি দিবাযামী,
পাষাণের চাঁদে অমৃত পেয়েছি আমি।

মানব

কোন্ দূর দেশে যাবে তুমি সদাগর?
একি অগণ্য পণ্য-লটবহর।
কত মণ ভার বহিছে একাই মন
একই তরীতে সাতটা রাজার ধন
এ তো নয় ঘোরা কেবল সাত-সাগর!

২

কত রূপ রস গন্ধ কথা ও সুর,
সঙ্গে তোমার? যাত্রা কোন্ সুদূর?
এ-ব্যবসা তব এক জন্মের নয়
কত লাভক্ষতি, কি বিরাট সঞ্চয়!
কিছু বুঝি আমি, না হই জাতিস্মর।

৩

সদাগর তব ভেসেই যাওয়া কি কাজ?
না না তুমি নানা পণ্যের অধিরাজ।
রস ভূয়িষ্ঠ ভাব ভূমিষ্ঠ মন—
কি মহার্ধনের করিছ অন্বেষণ
ঘুরিয়া এসেছ তুমি কত বন্দর?

৪

রেখে যাও আর নিয়ে যাও তুমি যাহা
জানাইয়া যাও—আবার আসিবে আহা।
সৃষ্টির মাঝে নাহিকো তোমার জুড়ি
সদা অমৃতের সন্ধানে ফের ঘুরি—
ফিরে ঘিরে আসে তাই তব 'মধুকর'।

৫

এই গতায়তি এই যে পর্যটন
ওগো সদাগর উদাস করে এ-মন।

এ-যাওয়া কেবল ঘুরিয়া আসিতে যাওয়া
এত নয়নের তাই এত পথ-চাওয়া,
এত ডোরে বাঁধা তাই তব অন্তর।

৬

এক খেয়াতেই হত যদি সব শেষ
কেন এ বিপুল পণ্যের সমাবেশ?
অতীতের লাগি কেন-বা এমন কাঁদা
ভবিষ্যতের করে কেন রাখী বাঁধা,
কেন এত লীলা লয়ে অবিনশ্বর।

৭

ধ্রুবতারা দেখে যাত্রা তোমার জানি
যত নিয়ে যাও তার বেশি আলো টানি।
সে-দেশ হইতে এনে তুমি যাহা দেহ
হয়তো নূতন হয়তো বা অজ্ঞেয়,
তবু চেনা চেনা দাগ যে উহার 'পর।

৮

এবারেই শেষ এ-কথা কেমনে ভাবি?
অফুরন্তে ও অনন্তে তব দাবি।
তুমি চাহনাকো ক্ষণিকের সম্ভোগ
আছে শাশ্বত সনাতন সাথে যোগ,
মার্কণ্ডেয় নহেকো তোমার পর।

কাব্যসম্ভার
১৯৬৭

বিদায়বেলা

সকল বাঁধন ছিঁড়তে হবে, সময় নাহি বাকি রে—
যাবার আমার সময় হল—শঙ্খ জানায় ডাকি রে।
ডাক শুনেছি, শুনেছি ডাক, যেতে হবে জল্‌দি হে—
ও ভিজে পথ ভিজাব না তবু নয়ন জল দিয়ে।
দেবযানে যে যাবে চলে তাহার আবার ভয় কিসে?
যাহার মা আনন্দময়ী নিরানন্দ রয় কি সে?
কাটল জীবন সুখে-দুখে নয়কো নেহাত মন্দ,
পান করেছি সহস্রদল পদ্ম মকরন্দ।
পেয়েছিলাম অভেদ আমি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি।
বেদন ব্যথা ঢের পেয়েছি কাউকে নাহি দুষ্‌ব—
ফুটল কাঁটার বৃন্তে আমার পারিজাতের পুষ্প।

২

গ্রামটি মোদের গ্রাস কোরো না অটুট রেখো ভাই রে,
যাবার সময় বন্ধু 'অজয়', এ ভিক্ষাটি চাই রে।
প্রণাম করি 'লোচনদেবে' নমি সজল চক্ষে,
গত এবং আগত ও অনাগত লোককে।
মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে 'মা' 'মা' বলে কাঁদব—
প্রথম আশীর্বাদের কুসুম চেলাঞ্চলে বাঁধব।
মাধবীতে অযুত স্তবক—ফুটবে মধু মঞ্জরি—
কোকিল হয়ে ডাকব, যাব ভ্রমর হয়ে গুঞ্জরি।
প্রণাম করি বিশাল ভারত, বঙ্গভূমি ধন্য—
স্বাধীন দেশের তনয় হয়ে মৃত্যুও হয় পুণ্য।
ক্ষপয়তু পুনর্জন্ম—হে নীল লোহিত কান্ত—
যাত্রা পথটি কর আমার সুন্দর শিব শান্ত।

৩

এ নয়তো রোগশয্যা শুধু দর্ভ আসন দিব্য—
দেবারতির মাটির প্রদীপ আনন্দেতে নিভব।

এ-ও তো এক তপস্যা মোর বেশ পেরেছি জান্‌তে
দিবস-নিশি জননীকে ডেকেছি একান্তে।
বিরাম-বিহীন ব্যাকুল স্বরে জপিয়াছি নাম গো,
যজ্ঞ আমার সাঙ্গ হবে—এবার আমি থামব।
রইল সুখ ও শান্তি ভবন—পরিজনে ভর্তি,
সেবক তারা—রইল মাগো তুমিই গৃহকর্ত্রী।
কি পুণ্যেতে স্বর্গে যাব—আমি যে জীববদ্ধ—
আকাঙ্ক্ষা মোর হতে শুধু তোমার পূজার পদ্ম।
যুগের যুগের শরৎ জুড়ে ফুটব প্রেমানন্দে—
আগমনী গানের সুরে—রূপে এবং গন্ধে।

টবের অশথ

রুপেছে এক অশত্থ তরু ক্ষুদ্র মাটির টবে,
দশটি বছর আছে আরও দশটি বছর রবে।
কোথায় তাহার সে উচ্চ শির কোথায় সরল শাখা,
ক্ষুদ্র কুসুম পাদপ সম ক্ষুদ্রতা তার আঁকা।
যখন চাহি উহার পানে আমার মনে হয়
রুদ্র এমন ক্ষুদ্র হয়ে কেমন করে রয়।
এ যেন হে ইন্দ্ররাজা সংগ্রামেতে হারি,
মালীগিরি করছে এসে রাবণ রাজার বাড়ি।
মায়াবাদের সাধ নাহিকো অন্নাভাবের টানে,
শঙ্কর হায় লিখছে যেন ঋজুপাঠের মানে!
কোথায় মানস অলকা তার সাধ্য নাহি যেতে,
কালিদাসের কাটছে জীবন বিয়ের শোলোক গেঁথে।
কোথায় গেল নন্দবংশ, চন্দ্রগুপ্ত রাজা—
চাণক্য গোমস্তা হয়ে শাসছে যেন প্রজা!
ক্ষুদ্র গ্রামের পাঠশালাতে ছাত্রদিগে লয়ে
নেপোলিয়ন শেখাচ্ছে ড্রিল গুরুমশায় হয়ে!

ভক্তের ভয়

প্রভাতের কমলের মাঝে হেরি ক্ষুদ্র কীটাণুর দল,
শিশুর কোমল মনে রাজে যেন ছোট দুশ্চিন্তা সকল।
উদাসীন সাধকের চোখে যেন ক্ষীণ সংসারের মায়া
আরতির দীপের আলোকে শ্যামা পোকা ফেলে যেন ছায়া।
এ যেন সাত্ত্বিক মহাদানে অসতর্ক গরবের ছিটা,
অনবদ্য ভজনের গানে ভুল শব্দ—লাগে বটে মিঠা!
এ যেন রে নৈবেদ্যের থালে, কামনার ক্ষুদ্র পিপীলিকা,
কমলার কমনীয় ভালে উল্‌কির হিজিবিজি টিকা।
এ যে শুদ্ধ শুভ্র শতদল—রত্নাকর ঋষি মহাকবি,—
ভাসে চিত্তে যেন রে চঞ্চল, দুষ্ট সঙ্গী দস্যুদের ছবি।
যতই পবিত্র হও তুমি—তবু ভক্ত ভুলোনাকো তাঁকে,
ভকতির গৌরবের সনে পতনের বীজ সুপ্ত থাকে।

গ্রামের টান

গ্রাম ছেড়ে কি থাকতে পারি? আমি যে গ্রাম ভুলতে নারি।
আমার মুখে স্তন্য দিল—এ গ্রাম তাহার বুক নিঙাড়ি।
থাকব গ্রামের সবার মাঝে
লাগব গ্রামের সবার কাজে।
উঠব রাঙা রবির সনে রঙিন করে অজয়-বারি।

আসবো ফুলে, আসবো ফলে, আমের নূতন মঞ্জরিতে।
ভ্রমর হয়ে আসব আমি গ্রামের গীতি গুঞ্জরিতে।
কোকিল হয়ে কুহুস্বরে
ঝঙ্কারিয়া সোহাগ ভরে,
আমার ডাকে উঠবে জেগে, পরান সবার নিব কাড়ি।

শুনবো আমি মেলার ঢেঁড়ি—শুনবো ভোরে কানটি পেতে,
'বাজার ঘাটে' খেয়ার শেষে ডাকটি মাঝির শুনবো রেতে।
শুনবো শীতে পেচক ডাকা
নইলে যে রাত লাগবে ফাঁকা।
দেখবো প্রাতে আসবে ডেকে আকাশ-পথে কাকের সারি।

স্নানার্থীদের ভিড় দেখিব গ্রামের মেলা বসবে যবে।
'ভোগ আরতির' গান শুনিব 'লোচন পাটের' মহোৎসবে।
পূজার মহা অষ্টমীতে
প্রথম প্রণাম আসবো দিতে,
লব প্রসাদ বিল্বপত্র দেউল-দ্বারে হাঁটু গাড়ি।

আমি গ্রামের চির দিনের সুখে দুখে থাকবো সাথে।
মায়ের কাছে বর লভিব—রইবে সবাই 'দুধে ভাতে'।
আসুক আপদ বিপদ যত
হবে না শির করতে নত,
বলব জোরে—'ভয় করো না' মোদের মা রাজ-রাজেশ্বরী।'

কাঁটাবন

তীক্ষ্ণ মোবা, বিঘ্ন মোড়া কণ্টকের এই পল্লীতে—
আলাপ করে কাঁটার ফুল আর নির্ভয়ে বনমল্লীতে।
ময়না থাকে তরুর শিরে,
আমরা থাকি তাকেই ঘিরে,
কলসি কাঁখে সাঁওতালিরা ক্বচিৎ আসে জল নিতে।

জলে পানিফলের কাঁটা ডাঙায় মোদের ছাউনিটা
কণ্টকিত করতে পারি আমরা চাঁদের চাউনিটা।
আরাম করে কেউটে থাকে
কেউ করে না ত্যক্ত তাকে,
শশক-শিশু—ধরবে তাকে? এত সহজ পাওনি তা।

রসিক পথিক হেসেই বলে—থাক বাঁধিয়া থাক গ্রহ,
শজারুর এই উপনিবেশ ঢুকতে নাহি আগ্রহ।
এখানেতে কাঁটার ভিড়ে
যায় ভ্রমরের পাখনা ছিঁড়ে,
বনবরাহ দূরেই থাকে—ঘেঁষেনাকো ব্যাঘ্রও।

পাখিও গায়, ফুলও ফোটে, জীবন মোদের মন্দ না।
ভীমরুল ও ফড়িং থাকে টুনটুনি ও চন্দনা।
তীরন্দাজের এই যে মাটি,
ভয় করে লোক ফেলতে পাটি,
মোদের কেবল শরই আছে করতে গুরুর বন্দনা।

প্রতীক্ষা

দিদিমা মোদের যেতেন গঙ্গা নইতে,
        গোরুর গাড়ির পথ চেয়ে থাকি মোরা,
সে চাওয়া মিষ্ট সব প্রতীক্ষা চাইতে,
        প্রাপ্যের চেয়ে আনন্দ বুকজোড়া।

দূরে বহুদূরে যেত খর শিশু দৃষ্টি,
        সকল গাড়িকে মনে হ্ত সেই গাড়ি,
বলদের রঙ বদলাত অনাসৃষ্টি,
        টপ্পরগুলা ভ্রম লাগাইত ভারি।

ছুটিয়া যেতাম দূর থেকে গাড়ি দেখে,
        গাড়ি নয় মহারানীর সে ভাণ্ডার।
সকল জিনিস আসিত আদর মেখে,
        বাঁশি টুমটুমি লাট্টু কত কি আর!

দিদিমার হাসি ঢলঢল স্নেহরসে
        সে দৃষ্টি শুধু সোহাগ মমতা মাখা,—
প্রাণ ঢের শোনে কাটে কটা কথা পশে,
        মোরা মৌমাছি, দিদিমা আঙুর পাকা।

সে পথ চাওয়ায় শুধু আনন্দ আশা
        ছিলনাকো দ্বিধা শঙ্কা কি সংকোচ,
কানায় কানায় পূর্ণ সে ভালোবাসা
        মেনকার গৃহে যেন অমৃতের ভোজ।

তারপর কত বছর চলিয়া গেছে—
        জীবন কাটিল কেবলি প্রতীক্ষায়।
আনন্দের সে স্মৃতিটুকু মনে আছে—
        আবিরের গুঁড়ি উৎসব আঙিনায়।

মেনি

মেনিটাকে দেখছি না কিন্তু,
মাছ খায় হাঁড়ি থেকে   লাভ নেই তারে রেখে
রাখা দায়—ঘরে দুধ দই তো!
সব বাড়ি, সব ঠাঁই গতি যে—
নিত্য সবার করে ক্ষতি সে,
ছেলেদের বিছানায়   আরামেতে ঘুম যায়
করেনাকো উৎপাত বই তো।

দোষ ছাড়া গুণ নাই বিন্দু—
তবু কি আকর্ষণ   বোঝে না অবোধ মন
ছেড়ে দিতে চায়নাকো কিন্তু।
হোক সে যতই হোক দুষ্ট—
কাছে থাকাতেই তারা তুষ্ট,
কোথা গেল পথ ভুলো   কাঁদিতেছে ছেলেগুলো
পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট ওই তো!

মিনুর কোকিল

ওরে খোকা, কোথা তুই শিখেছিস ফন্দি—
একেবারে পিকরাজে করেছিস বন্দী!
দোরে গোটা সুরলোক একে করে কেন্দ্র
যে সে নয় এ যে বাপু দ্বিতীয় দেবেন্দ্র!
দেখ ওর রাঙা আঁখি বুঝি জলে ভাসছে—
সুলতান তুই নাকি? বুক মোর কাঁপে যে
রেকেছিস কাছে এনে মহাকবি হাফেজে!
সাথে তার কালিদাস বাস করে নিত্য—
ছদ্মবেশেতে তুই বিক্রমাদিত্য!
মনোভাব তোর কিছু পারিনে যে বুঝতে,
আকবর ন'স চাস তানসেনে পুষতে!
পথ তোর ফুলে ছাওয়া, সুধা অফুরন্ত—
সাথে সাথে ফেরে তোর সুচির বসন্ত।

নৌকাপথে

১

মাঝি,—গিয়েছি এ পথে অর্ধ-শতাব্দী আগে—
চলুক তরী—পথটি বড় ভালো যে লাগে।
কত ফুলের গন্ধ আসে, কত পাখির স্বর,—
আধেক ভোলা চেনা গানের সুরটি মনোহর,
—রাঙাল পথ কে যেন আজ নবানুরাগে।

২

ব্যথার পথই এমনি করে হয় রে ছায়াপথ,
ঘরের ব্যথাই ভাগ করে লয় সমগ্র জগৎ।
ব্যথাই ভরে সুধার কলস লবণ সাগরে।
ব্যথাই গড়ে স্মৃতির দেউল মণি মর্মরে।
সুরধুনী আসেন চিতাভস্মের দাগে।

৩

তরী চরণ পরশে কার হল যে সোনা—
দেখছি আমি মাঝি তুমি খবর রাখো না।
মৃতই দেছে যাত্রা তোমার অমৃত্ত করি,—
আঁখি জলের মুক্তা দিল তরণী ভরি,
এবার মাঝি সুদূর গঙ্গা-সাগর যে ডাকে।

৪

আসছে হাওয়া কালিদহের কমল কাননের—
এবার দূরের পাল্লা মাঝি,—বিঘ্ন আছে ঢের।
চারি দিকে মেঘের ঘটা—সাগর উথলে—
খেলছে তবু সোনার আলো সুনীল জলে,
কমল বনের কাছেই এবার তরী ভিড়াবে।

৫

এবার হবে—হয়তো—কমল-কামিনী দর্শন—
যাঁহার লাগি সদাই এ মন হয়রে উচাটন।
দেখা দেবেন গণেশ কোলে চন্দ্রভালী মা—
সফল জীবন—পূর্ণ হবে সকল কামনা।
ডাকছে আমায় মায়ের পায়ের পদ্ম পরাগে।

কবির কথা

যা বল মনঃ ক্ষোভে—
সুখ্যাতি করি জেনো করিনাকো পুরস্কারের লোভে।
নিত্য রবির স্তোত্র যে গাই,
সেখান হইতে আমরা কি পাই?
অপূর্ব রূপ—প্রভাতে উদয় সন্ধ্যায় যবে ডোবে।

তোমারে শুধাই সাথী?
'ছো' মারিবে বলে ভয়ে তো সাপের করিনাকো সুখ্যাতি।
থাক্ হুল তবু ভ্রমরই যে প্রিয়,
গুব্‌রে পোকার পার জয় দিয়ো,
বুদ্ধিমানের তক্‌মাটা পাক গম্ভীর-বেদী হাতি।

যশ তো যায় না গাওয়া—
তাজমহলের ছাদ যদি হয় উলা খড় দিয়ে ছাওয়া?
মানুষের মাথা ফাঁকা আর ফাঁপা
তাজ ও মুকুটে যায়নাকো ঢাকা,
ফাটা বংশের সংবাদ দেয় চিৎকার করে হাওয়া।

এ তো অকারণ রাগা—
শব সাধনার অর্থ নহেকো শ্মশানেতে রাত জাগা।
শবাসনা নয়—শুধু শব সাথ—
শিয়ালও তো জাগে সুদীর্ঘ রাত,
সিদ্ধিলাভের সেও আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে কি হাঁ গা?

দাও যারে যাহা শোভে,
ষাঁড়ে দেগে দিয়ে জয়-পত্রটা অশ্বের লাগি থোবে।

কারু ধূপ ধুনা, চন্দন কারু,
কাহারো লাগিয়া গোবরের লাড়ু।
চতুর্ভুজের প্রাপ্য কেমনে চতুষ্পদেরা ছোঁবে?

যশই যাহারা যাচে—
পায় না তাহারা প্রতিষ্ঠা হায় ঘেঁসে না তাদের কাছে।
চাঁদ উঠে হয় সাগর উতল,
ফুকারিয়া ফেরে চকোরের দল,
কস্তুরী মৃগ ছুটে সুরভি যে ছোটে তার আগে পাছে।

দ্বিধা

গায়ে আমাব লাগল এ কোন অবিশ্বাসীর হাওয়া?
হয় না কেন ব্যাকুল হয়ে নামটি তাঁহার গাওয়া?
যায় না যে নাম দাগটি রেখে,
নয়ন জলের অভিষেকে—
পরশ মণির পবশ কেন যায় না বুকে পাওয়া?

অনন্ত নির্ভর রে আমার—অনন্ত বিশ্বাস,
কমাল হায় কোন কালিয়ার বিষাক্ত নিঃশ্বাস?
সন্দেহ পাপ হেথায় কেনে?
হঠাৎ এল বজ্র হেনে
চকোরে হায় ভুলাতে চায় চাঁদের পথ চাওয়া!

শ্রীফুলিয়ার পাটের ধূলি—মাখতে আমাব সাধ।
ভঞ্জন হোক, ভঞ্জন হোক, সকল অপরাধ।
ব্রজের রজেব অধিকারী,
এবার যেন হতে পারি,
মাধুকরীর উপর যেন জন্মে আমার দাওয়া।

বন্ধুর পথে

কবর এখন তোমায় ডাকিছে, আমায় ডাকিছে চিতা,
এস দুটা শেষ কথা কয়ে নিই এস কাছে এস মিতা।

পশার ছক তো গুটানো হয়েছে, কড়িতে ভরেছে তাক
সোনালি এ সাঁজে এস দুজনায় বিন্তিই খেলা যাক।

তরণী মোদের পায় নাই পাল, খরধার ছিল পানি,
পাল্লা সুদূর ভিড়ায়েছি ঘাটে—আগাগোড়া গুন টানি।
লাভ তো কিছুই করিতে পারিনি তরীই এসেছি বাহি,
ভাবি এ হাটেতে কেন এসেছিনু মোরা অব্যবসায়ী।

ফুল কুড়ানোই পেশা ছিল যার আঙিনা যাহার দূর,
অশ্ব কিনিতে মেলায় তাহারে কে পাঠাল শোণপুর?
পল্লীর টোলে মগ্ন যে ছিল লয়ে লণ্ড লুণ্ড লৃট,
সেয়ার কিনিতে কে তারে পাঠাল সটান ক্লাইভ স্ট্রিট!

এ কঠিন ঠাঁই বৃথা এসেছিনু খাপছাড়া দুটা প্রাণী
ফিরিবার পথ করিতেছে যেন সেই কথা কানাকানি।
চাউল না লয়ে বাউলের মতো নেচেই এলাম ঘুরে,
শূন্য ঝুলির বহর দেখিয়া অন্যে হাসিছে দূরে।

লভিয়া মানব জনম—যাহারে দুর্লভ বলে লোকে,
কি যে করিলাম, বলার মতন কিছুই ঠেকেনি চোখে।
আরব নিশির হাজার কেটেছে একটা কেবল বাকি,
নাটাই-এ সুতা শেষ হয়ে আসে মনে হয় সবি ফাঁকি।

মেলা দেখা শেষ। পূরবী বাজিছে—ওই শোন নহবতে,
দেরি করিয়ো না আঁধার জমিছে পল্লীর আলপথে।
চির শিশু মোরা কাটাইনু দিন ধরণীরে ভালোবাসি,
মরণের কাঁধে চড়ে ফিরে যাই বাজাতে বাজাতে বাঁশি।

লতার ব্যথা

মুকুল ঝরে—মুকুল ঝরে—হায় রে,
লতার বুকে কি দাগ রেখে যায় রে।
কত বেদন যায় সে দিয়ে,
কত সোহাগ যায় সে নিয়ে।
বিষাদেতে গোটা কানন ছায় রে।

এই মুকুলই কুসুম হয়ে ফুটত
হিয়ার সুবাস মলয় বায়ে ছুটত
ভেঙে গেল কতই আশা,
কতই কচি ভালোবাসা,
ভাবতেও হায় কান্না আমার পায় রে।

ছোট মুকুল, নেহাত ছোট হয় তো,
ব্যথা তাহার কিন্তু ছোট নয় তো।
সকল ফুল ও মুকুল মাঝে,
সদাই তাহার অভাব বাজে,
বনস্থলী কাতর সে ব্যথায় রে।

লতার কাছে কুঁড়ির নাহি জাত রে
সকল কোরক—কোরক পারিজাত রে।
এমন মধুর মায়ের স্নেহ
সকল ছেলেই কার্তিকেয়
আনন্দেতে তিন ভুবন মাতায় রে।

রামধনু

রামধনু আমি শুধু রামধনু ভাই,
জলভরা চোখে আমি হাস্য ফুটাই।
নীলিমার কোল জুড়ি—পুলকের ফুলঝুরি,
নভ হাসি কান্নায় পান্না গড়াই।

অরুণের সাতরঙা অশ্বের রথ,
আমারি রঙিন বুকে খুঁজে পায় পথ।
ব্যোমবুকে আনি ধীরে—কি ময়ূরপঙ্খিরে,
রূপে আমি অরূপের মাঝে দিই ঠাঁই?

রামধনু,—নাই তবু হেমমৃগে আশ,
করি নাই বালি-বধ, দশানন-নাশ।
সুষমার শরজালে,—জিনিয়াছি এ নিখিলে,
নবঘন রূপ হেরি সাথে সাথে ধাই।

আকাশের ঘননীল অশোকের বন
মেঘ না এ, জানকীর উচাটন মন!

রঙিন আমি আশা—করি সেথা যাওয়া আসা,
স্নেহধারে নিতি তাঁর নবপ্রাণ পাই।

রামধনু—আমি জল-কণিকার গড়,
শিখিপাখা দিয়ে রচা পরীদের ঘর।
অমৃতের উৎসবে—কচি হিয়া ডাকি নভে,
কচি হাতে সোহাগের রাখী বেঁধে যাই।

ফুলের আশা

শিথিল হতেছে বৃন্ত রে ফুল, লাগিতেছে ঝড় গাছে
আর দেরি নাই ঝরে পড়িবার সময় আসিছে কাছে।
কোথা সে বাহার, কোথা পরিমল?
কোথা সরে গেছে মৌমাছি-দল?
খসিয়া পড়েছে সঙ্গীরা তোর দিবসের খর আঁচে।

ফোটা আর ঝরা এই যাতায়াত চলেছে চিরন্তন
একটু আলোক একটু গন্ধ একটু আন্দোলন।
ফুল জনমের পরিণতি এই
ইহার বেশি কি আর কিছু নেই?
বুকের ভিতর কে তবে বলিছে—আছে নিশ্চয় আছে?

আছে গন্ধের মণিমন্দির রূপের মহল ভাই
ভাগ্য যাহার সুপ্রসন্ন সেই লভে সেথা ঠাঁই।
সেই গন্ধেই সুরভিত সব
ভুবন ভরিয়া তারি উৎসব
সুন্দর যাহা গঠিত হতেছে—সেই সে রূপের ছাঁচে।

বিফল নহেকো এ এক সাধনা এই ফোটা এই ঝরা,
সেই হরি-পরিমণ্ডল লাগি নিজেকে যোগ্য করা।
আসিবে তোমার সে সুপ্রভাত,
সে প্রেমময়ের হবে আঁখিপাত,
যুগে যুগে যাহা সাধু ও সাধক ব্যাকুল কণ্ঠে যাচে।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৮৩ সালের ৩ মার্চ (১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১৯ ফাল্গুন) বর্ধমান জেলার কোগ্রামে মাতুলালয়ে কুমুদরঞ্জনের জন্ম। এই কোগ্রাম চন্ডীমঙ্গলের শ্রীমন্ত সদাগরের বাসস্থান, সতী বেহুলার জন্মস্থান, চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনদাসের জন্মভূমি, বৈষ্ণব ও শাক্ত-সাধনার মিলন-কেন্দ্র এবং পৌরাণিক বাহান্ন পীঠের অন্যতম। পিতা : পূর্ণচন্দ্র মল্লিক। 'মল্লিক' নবাবী-উপাধি। আসল পদবী সেনশর্মা বা সেনগুপ্ত। আদি নিবাস বর্ধমান জেলার বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখন্ড। মাতা : কোগ্রামের নবীনকিশোর মজুমদারের কন্যা সুরেশকুমারী।

শৈশব . পিতা পূর্ণচন্দ্র দীর্ঘকাল কাশ্মীরে থাকায় কবি নিঃসন্তান মাতামহের গৃহে প্রতিপালিত। কুমুদরঞ্জনের এক ভাই আশুতোষ এবং চার বোন হেমন্তবালা, চারুবালা, সরলাবালা ও সুনীতি। তাঁর শিশুমন গড়ে ওঠে রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, ভক্তমালের গল্প, বাউলগান, যাত্রা-কথকতা, মেঠো-গান, চন্ডীর পালা, রামপ্রসাদের গান এবং স্ব-গৃহে ভগবৎচর্চা ও আধ্যাত্মিক ভক্তির নির্মল আবহে। সেই সঙ্গে অজয় ও কুনুর নদী-বেষ্টিত কোগ্রামের প্রাকৃতিক শোভার আবিষ্টতায়। সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও অল্পে সন্তুষ্টি, ঈশ্বর-নির্ভরতা, স্বগ্রামপ্রীতি এবং মাতৃভক্তি কবির জীবনের দৃঢ়ভিত্তি।

শিক্ষা : ছেলেদের শিক্ষার জন্য মাতামহী কলকাতায় শাঁখারিটোলায় ঘরভাড়া নেন। কবি ১৮৯৫ সালে কলকাতার ডি.এন. দাসের সেঞ্চুরি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক পেয়ে বি.এ পাস করেন। পরে ওকালতির ইচ্ছায় রিপন কলেজে ভর্তি হয়ে আইনের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু সেই পাঠ সম্পূর্ণ করেননি।

বিবাহ-গার্হস্থ্য : প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় (সম্ভবত ১৮৯৯-১৯০০ সালে) শ্রীখন্ড নিবাসী যুগলকিশোর রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা সিন্ধুবালা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। অনটন-সত্ত্বেও অসীম মমতাময়ী, স্নেহশীলা-ভক্তিমতী সিন্ধুবালা সংসারের গুরুভার হাসি-মুখে বহন করেন। কবির সাতপুত্র :

জ্যোৎস্নানাথ, সরিৎনাথ, জগন্নাথ, রেবতীনাথ, পৃথ্বীনাথ, কৌশাম্বীনাথ ও কনিষ্কনাথ এবং তিনকন্যা : বাসন্তী, পুলোমা ও অঞ্জলি।

কর্মজীবন : ১৯০৬ সালের ২২ অক্টোবর কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুরোধে কোগ্রামের নিকটবর্তী মাথরুন গ্রামের নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে অস্থায়ী দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ৩১ বছর সেই পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করেন। মধ্যে কাশ্মীর-রাজসরকার থেকে একটি বড়ো চাকরির আমন্ত্রণ পেয়েও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

গ্রন্থ : কাব্যগ্রন্থ : শতদল (১৯০৬-১৯০৭); বনতুলসী (১৯১১); উজানি (১৯১১); একতারা (১৯১৪); বীথি (১৯১৫); চূণ ও কালি (১৯১৬); বনমল্লিকা (১৯১৮); দ্বারাবতী (১৯২০); রজনীগন্ধা (১৯২১); নূপুর (১৯২২); অজয় (১৯২৭); তূণীর (১৯২৮); স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮); শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৭); গরলের নৈবেদ্য (পাণ্ডুলিপি); কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার (১৯৭০); কুমুদ-কাব্যমঞ্জুষা (১৯৮১)।

মৃত্যু : ১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর কবির দেহান্ত ঘটে। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি ভারত-সরকারের পদ্মশ্রী উপাধি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান। সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্যতীর্থ'-এর 'তীর্থপতি' পদেও বৃত হন।